৬

মূল্যস্ফীতি
Inflation

ভূমিকা

মূল্যস্ফীতি এমন একটি পরিস্থিতি যখন অর্থের প্রকৃত মূল্য হ্রাস পায়। মূল্যস্ফীতির সময়ে একই দ্রব্য কিনতে আমাদেরকে বেশি অর্থ দিতে হয়। সাধারণত, মূল্যস্ফীতি এমন একটি পরিস্থিতি যখন দ্রব্য ও সেবার ক্ষেত্রে অর্থের যোগানের অনুপাত বৃদ্ধি পায় এবং এটি সাধারণ মূল্যস্তরকে বৃদ্ধি করে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে মূল্যস্ফীতি অর্থনৈতিক তত্ত্বের ব্যতিক্রমী। সাধারণত, পূর্ণ নিয়োগের পরে মূল্যস্ফীতি ঘটে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে, যদিও তাদের কিছু সম্পদ অব্যবহৃত থাকে তথাপি মূল্যস্ফীতি দেখা যায়। একটি উন্নয়নশীল দেশে, মূলধনের অভাব, নিম্নমানের প্রযুক্তি, ত্রুটিপূর্ণ উৎপাদন ব্যবস্থা এবং সঠিক পরিকল্পনার অভাবে মূল্যস্ফীতি ঘটে। বাংলাদেশও এসব সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং এখানে মূল্যস্ফীতি ঘটে।

২০২১ সাল থেকে বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর অর্থনীতিই শুধু আকস্মিক এবং দ্রুত মূল্যস্ফীতির সম্মুখীন হচ্ছে না, বরং বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল অর্থনীতিও মূল্যস্ফীতির সম্মুখীন হচ্ছে। ২০২২ সালের শুরুর দিকে অনেক অর্থনীতিবিদ এবং বিশ্বব্যাপী ব্যবসায়ী নেতারা ভেবেছিলেন যে এই ক্রমবর্ধমান মূল্যস্ফীতির প্রবণতা একটি নতুন মূল্যস্ফীতির যুগের সূচনা অথবা মূল্যস্তরের ওপর কোভিড-১৯ মহামারি দ্বারা সৃষ্ট অস্থায়ী যোগান সংকট প্রভাবের সংকেত দিচ্ছে । কিন্তু এখন পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে মূল্যস্ফীতি অব্যাহত থাকবে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় দুই সপ্তাহ

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৬.১: মূল্যস্ফীতির ধারণা
পাঠ-৬.২: মূল্যস্ফীতির কারণ ও ফলাফল
পাঠ-৬.৩: মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ
পাঠ-৬.৪: বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি
পাঠ-৬.৫: মূল্যসংকোচনের কারণ ও ফলাফল
পাঠ-৬.৬: মূল্যসংকোচন নিয়ন্ত্রণ

পাঠ ৬.১ মূল্যস্ফীতির ধারণা
Concept of Inflation

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

- মূল্যস্ফীতির সংজ্ঞা দিতে পারবেন;
- মূল্যস্ফীতির হার নির্ণয় করতে পারবেন;
- মূল্যস্ফীতির বিভিন্ন প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন;
- চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মূল্যস্ফীতি এবং খরচ বৃদ্ধিজনিত মূল্যস্ফীতির মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারবেন।

মূল্যস্ফীতি কাকে বলে?
What is inflation?

একটি বাজার অর্থনীতিতে দ্রব্য এবং সেবার দাম সবসময় পরিবর্তিত হতে পারে। কোনোটির দাম বৃদ্ধি, আবার কোনোটির দাম হ্রাস পায়। যখন দ্রব্য এবং সেবার দাম ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়, তখন মূল্যস্ফীতি ঘটে। অর্থাৎ, আপনি গতকালের চেয়ে আজকে একই পরিমাণ টাকা দিয়ে কম পরিমাণ দ্রব্য কিনতে পারবেন। সহজ কথায়, যখন মূল্যস্ফীতি বাড়ে, তখন ভোক্তাদের খরচ বেড়ে যায় কারণ দ্রব্যের দাম বেড়ে যায় এবং মানুষের কেনার সামর্থ্য বা ক্রয়ক্ষমতা কমে যায়। অন্য কথায়, মূল্যস্ফীতি সময়ের সাথে সাথে মুদ্রার মূল্য হ্রাস করে।

মূল্যস্ফীতি হচ্ছে ক্রয়ক্ষমতার একটি পরিমাপ। একটি নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক বছরে) দ্রব্য এবং সেবার দাম যে হারে পরিবর্তিত হয় সে হিসাবে মূল্যস্ফীতিকে সংজ্ঞায়িত করা হয়।

উদাহরণস্বরূপ, আপনি গত বছর ১ কেজি আপেল ১৫০ টাকায় কিনেছেন, কিন্তু দাম বৃদ্ধির কারণে আপনি এই বছর ১ কেজি আপেল ২০০ টাকায় কিনতে পারবেন। এর মানে হলো আপনার ক্রয়ক্ষমতা কমে গেছে।

বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ মূল্যস্ফীতির বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। অর্থনীতিবিদ Coulborn-এর মতে মূল্যস্ফীতিকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে, "যখন অত্যধিক পরিমাণ অর্থ খুব কম পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রীর পিছনে ধাবিত হয়"। অধ্যাপক Paul A. Samuelson বলেন "মূল্য এবং খরচের সাধারণ স্তর যখন বৃদ্ধি পায়, তখন মূল্যস্ফীতি ঘটে"। অধ্যাপক A. C. Pigou-এর মতে "মূল্যস্ফীতি হলো এমন একটি অবস্থা যখন আয় সৃষ্টিকারী কাজ অপেক্ষা মানুষের আর্থিক আয় অধিক হারে বৃদ্ধি পায় তখনই মূল্যস্ফীতি দেখা যায়"। J. M. Keynes-এর মতে, "মূল্যস্ফীতি হলো সামগ্রিক যোগানের উপর সামগ্রিক চাহিদার আধিক্যের ফল"। সুতরাং আমরা বলতে পারি, যখন দেশের প্রচলিত অর্থের পরিমাণ উৎপাদিত মোট দ্রব্যসামগ্রীর তুলনায় বেশি হয় এবং এর ফলে দ্রব্যমূল্য বা দামস্তর ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে তখন সেই অবস্থাকে মূল্যস্ফীতি বলা হয়।

মূল্যস্ফীতির হার
Rate of Inflation

মূল্যস্ফীতির হার গণনা করার জন্য মূল্যস্ফীতির হার সূত্রটি ব্যবহার করতে হবে। এটি একটি সাধারণ সূত্র যার মাধ্যমে প্রদত্ত বছরের মধ্যে শতকরা ব্যয় বৃদ্ধি বা হ্রাসের পরিমাণ দেখা যায়। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক হারের মতো, মূল্যস্ফীতির হার গণনা করতে একটি সূত্র ব্যবহৃত হয়। সাধারণত, সূত্রটির জন্য একটি নির্দিষ্ট সূচনা বিন্দুর প্রয়োজন হয়, তা অতীতের এক বছর বা মাস হতে পারে, যা একটি নির্দিষ্ট দ্রব্য এবং সেবার জন্য ভোক্তা মূল্যসূচক থেকে নেওয়া হয়। এর পরে, একই দ্রব্য এবং সেবার বর্তমান খরচের সাথে অতীতের খরচ তুলনা করা হয়। মূল্যস্ফীতি হার নির্ণয়ে সূত্রটি নিম্নরূপ:

$$\text{মূল্যস্ফীতি হার} = \frac{\text{বর্তমান বছরের দামসূচক} - \text{পূর্বের বছরের দামসূচক}}{\text{পূর্বের বছরের দামসূচক}} \times ১০০$$

অর্থাৎ, $I_R = \frac{P1-P0}{P0} \times 100$

এখানে, I_R = মূল্যস্ফীতির হার

P_1 = বর্তমান বছরের দামসূচক

P_0= পূর্বের বছরের দামসূচক

উদাহরণ: ধরা যাক ২০১৯ সালে ভোক্তার দামসূচক ছিল ১৫০ এবং ২০২১ সালে দামসূচক হলো ২০০, এক্ষেত্রে মূল্যস্ফীতির হার কত?

$$\text{মূল্যস্ফীতির হার } (I_R) = \frac{P1-P0}{P0} \times 100$$

$$= \frac{২০০ - ১৫০}{১৫০} \times ১০০$$

$$= \frac{৫০}{১৫০} \times ১০০$$

$$= ৩৩.৩৩\%$$

উপরোক্ত নিয়মে, P_0 হল অতীতের একটি নির্দিষ্ট মাস বা বছরের জন্য একটি নির্দিষ্ট দ্রব্য বা সেবার প্রারম্ভিক খরচ, যখন P_1 হলো একই দ্রব্য এবং সেবার ক্ষেত্রে বর্তমান খরচ (শেষ খরচ)। মূল্যস্ফীতির হারের সূত্রটি ব্যবহার করার সময় বর্তমান খরচ P_1 থেকে প্রারম্ভিক খরচ P_0 বিয়োগ করতে হবে। ফলাফল এই দুটি খরচের মধ্যে পার্থক্য দেখাবে, বা সহজ ভাষায়, সেই নির্দিষ্ট পণ্য বা পরিষেবার দাম কত বেড়েছে বা কমেছে। তারপরে ফলাফলটিকে P_0 দ্বারা ভাগ করতে হবে, এবং ১০০ দ্বারা গুণ করতে হবে। অর্থাৎ, মূল্যস্ফীতির হার হলো মূল্য স্তরের শতকরা পরিবর্তন।

মূল্যস্ফীতির প্রকারভেদ

Types of Inflation

অর্থনীতিতে মূল্যস্ফীতির বিভিন্ন রূপ রয়েছে। মূল্যস্ফীতির কারণ ও দামস্তর বৃদ্ধির গতিবেগের ভিত্তিতে অর্থনীতিবিদগণ মূল্যস্ফীতিকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। বিভিন্ন প্রকার মূল্যস্ফীতি সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো।

কারণভিত্তিক প্রকারভেদ

চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মূল্যস্ফীতি: সামগ্রিক চাহিদার দ্রুত বৃদ্ধির ফলে যে মূল্যস্ফীতি ঘটে তা হছে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মূল্যস্ফীতি। এ ধরনের মূল্যস্ফীতিতে দ্রব্য বা সেবার সরবরাহের চেয়ে দ্রব্য বা সেবার চাহিদা বেশি হয়। সাধারণত সামগ্রিক অর্থনৈতিক বৃদ্ধি, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন বা ক্রমবর্ধমান মূল্যস্ফীতির হারের কারণে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মূল্যস্ফীতি ঘটে। এ ধরনের মূল্যস্ফীতি কর্মসংস্থান বাড়াতে পারে এবং অর্থনীতিকে উদ্দীপিত করতে পারে; তবে সাথে সাথে দ্রব্যসামগ্রীর দামও বাড়িয়ে দেয়।

খরচ বৃদ্ধিজনিত মূল্যস্ফীতি: শ্রমিকের মজুরি, কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির মতো উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণগুলোর দাম বৃদ্ধির কারণে উৎপাদন খরচ বেড়ে যায়। এই বর্ধিত খরচ দ্রব্যসমূহের যোগান হ্রাসের দিকে পরিচালিত করে। এ অবস্থায় চাহিদা স্থির থাকলেও দ্রব্যের দাম বৃদ্ধির ফলে সামগ্রিক মূল্যস্তর বৃদ্ধি পায়। এভাবে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধির ফলে দামস্তরের যে ক্রমাগত বৃদ্ধি ঘটে তাকে খরচ বৃদ্ধিজনিত মূল্যস্ফীতি বলে।

মজুরি বৃদ্ধিজনিত মূল্যস্ফীতি: মজুরি বৃদ্ধির ফলে একটি অর্থনীতিতে দাম বাড়তে পারে। এই ক্ষেত্রে, উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের কর্মীদের আরও বেশি মজুরি প্রদান করতে হয় এবং ক্রমবর্ধমান মজুরি প্রতিষ্ঠানগুলোতে ব্যয় বৃদ্ধি করে, যা দ্রব্য বা সেবার মূল্যস্ফীতি ঘটায়। এ ধরনের মূল্যস্ফীতি মূলত মজুরি বৃদ্ধিজনিত মূল্যস্ফীতি।

ঘাটতি ব্যয়জনিত মূল্যস্ফীতি: যুদ্ধ বা উন্নয়ন ব্যয়ের অর্থায়নের জন্য সরকারকে বিপুল বাজেটের ঘাটতি পূরণের উদ্দেশ্যে নতুন কাগজের নোট ছাপতে হয়। এ অবস্থায় দেশে অর্থের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় চাহিদা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু দেশে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ে না। এতে দামস্তর বৃদ্ধি পায়। এটি ঘাটতি ব্যয়জনিত মূল্যস্ফীতি হিসাবে পরিচিত।

আর্থিক প্রবৃদ্ধিজনিত মূল্যস্ফীতি: যখন অর্থনীতিতে বেশি অর্থ থাকে, তখন মূল্যের স্তরটি অর্থের হ্রাসকৃত মূল্যকে প্রতিফলিত করে। অর্থাৎ মূল্যস্তর বৃদ্ধি পায় এবং অর্থের মূল্য হ্রাস পায়। এটি আর্থিক প্রবৃদ্ধিজনিত মূল্যস্ফীতি নামে পরিচিত। সাধারণত সরকার বা কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক অতিরিক্ত কাগজী নোট ছাপানোর ফলে এধরনের মূল্যস্ফীতি ঘটে।

ঋণজনিত মূল্যস্ফীতি: আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বিশেষ করে ব্যাংকসমূহ অর্থনীতির প্রয়োজনে প্রচুর ঋণের প্রসারণ ঘটায়। এই পরিস্থিতি দামস্তর বৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করে। এ কারণে যে মূল্যস্ফীতি বিকাশ লাভ করে তাকে ঋণজনিত মূল্যস্ফীতি বলা হয়।

দামস্তরের গতিভিত্তিক প্রকারভেদ

মৃদু মূল্যস্ফীতি: দামস্তর খুব ধীরগতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকলে তাকে মৃদু মূল্যস্ফীতি বলে। যদি দাম বার্ষিক ৩% বা তার কম বৃদ্ধি পায়, ইহা মৃদু মূল্যস্ফীতি। এ ধরনের মুদ্রাস্ফীতি অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর নয়। প্রকৃতপক্ষে, এটি একটি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয়।

পদসঞ্চারী মূল্যস্ফীতি: এই ক্ষেত্রে, মূল্যস্ফীতির হার ৩% থেকে ১০% এর মধ্যে পড়ে। এ ধরনের মূল্যস্ফীতি অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। এসময় দাম আরও বাড়ার আশঙ্কায় ভোক্তারা দ্রব্যসামগ্রী মজুদ করতে শুরু করেন। এটি অতিরিক্ত চাহিদা সৃষ্টি করে এবং দাম আরও বৃদ্ধি পায়।

ধাবমান মূল্যস্ফীতি: এই মূল্যস্ফীতি ১০% বা তার বেশি বেড়ে যায় এবং এটি অর্থনীতির জন্য সম্পূর্ণ বিপর্যয়। এ ধরনের মূল্যস্ফীতিতে অর্থ খুব দ্রুত তার মূল্য হারায় এবং ব্যবসাগুলি খরচ এবং দামের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারে না। বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগে আস্থা হারায়, সরকার তার বিশ্বাসযোগ্যতা হারায় এবং অর্থনীতি অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে। যে কোনো মূল্যে এই মূল্যস্ফীতি এড়ানো উচিত।

অতি মূল্যস্ফীতি: এটি মূল্যস্ফীতির শেষ পর্যায়। এ অবস্থায় মূল্যস্ফীতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। মুদ্রা কর্তৃপক্ষের গৃহীত কোনো ব্যবস্থাই দাম নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। মুদ্রাস্ফীতির হার মাসিক ভিত্তিতে ৫০% হতে পারে। এটি সাধারণত ঘটে যখন সরকার যুদ্ধের জন্য কাগজের নোট ছাপায়। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানিতে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হাঙ্গেরিতে এধরনের মূল্যস্ফীতি দেখা গিয়েছে।

নিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে প্রকারভেদ

অবাধ মূল্যস্ফীতি: মুদ্রাস্ফীতিকে 'অবাধ' বলা হয় যখন কোনো দেশের সরকার ও আর্থিক কর্তৃপক্ষ জনগণের ব্যয় নিয়ন্ত্রণে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করে না। জনগণ তাদের বর্ধিত আয় অবাধে ব্যয় করে। ফলে চাহিদা ও দামের তীব্র বৃদ্ধি ঘটে। অর্থাৎ যখন একটি দেশে দামস্তর বেড়ে যায় এবং যেখানে সরকার বা কোনো কর্তৃপক্ষের দ্বারা দামের ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না, তখন যে ধরনের মূল্যস্ফীতি সৃষ্টি হয় তাকে অবাধ মূল্যস্ফীতি বলে।

দমিত মূল্যস্ফীতি: মূল্যস্ফীতি যখন দমন করা হয় অর্থাৎ, সরকার এবং আর্থিক কর্তৃপক্ষ দামকে উচ্চ স্তরে বাড়তে দেয় না, তখন এটিকে দমিত মূল্যস্ফীতি বলা হয়। বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে সরকার দ্রব্য ও সেবার দাম নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। যেমন- মূল্য নিয়ন্ত্রণ, কিছু প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে রেশনিং ব্যবস্থা, দ্রব্যের সর্বোচ্চ দাম নির্ধারণ, নির্দিষ্ট সীমার অধিক মুনাফার ওপর কর ধার্যকরণ, বিনিয়োগ ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, আমদানির ওপর উচ্চ কর, ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি।

কেইনসীয় প্রকারভেদ

প্রকৃত মূল্যস্ফীতি: লর্ড কেইনসের মতে, পূর্ণ কর্মসংস্থানে পৌঁছানোর পর একটি দেশে যে মূল্যস্ফীতি দেখা যায় তা হচ্ছে প্রকৃত মূল্যস্ফীতি। উৎপাদনের সব উপকরণসমূহ পূর্ণ কর্মসংস্থানে পৌঁছার পর দ্রব্য ও সেবার উৎপাদন আর বাড়ানো সম্ভব নয়। এ অবস্থায় অর্থের যোগান বৃদ্ধি পেলে উৎপাদন বৃদ্ধি না পেয়ে দামস্তর বাড়তে থাকবে।

আংশিক মূল্যস্ফীতি: লর্ড কেইনসের মতে, যতক্ষণ অর্থনীতিতে অব্যবহৃত সম্পদ থাকে ততক্ষণ সাধারণ দামস্তর বাড়ে না। অর্থনীতিতে পূর্ণ কর্মসংস্থানের আগে বিভিন্ন বাধার কারণে যখন সামগ্রিক ব্যয় বৃদ্ধি পায়, তখন এ অবস্থা দাম বৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করে। এভাবে পূর্ণ কর্মসংস্থানের আগে যে মূল্যস্ফীতি ঘটে তা আংশিক মূল্যস্ফীতি হিসেবে পরিচিত।

চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মূল্যস্ফীতি

Demand pull inflation

চাহিদা বৃদ্ধিজনিত চাপে যখন অর্থনীতিতে সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং দ্রব্য ও সেবার যোগান একই থাকে, তখন যোগান ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে পারে না এবং দ্রব্য ও সেবার দাম বেশি হয়। ফলে অর্থনীতিতে যে মূল্যস্ফীতির সৃষ্টি হয়, তাকে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মূল্যস্ফীতি বলে। এই ধরনের মুদ্রাস্ফীতি যেকোনো স্বতন্ত্র কারণ থেকে উদ্ভূত হতে পারে, যা চাহিদাকে বৃদ্ধি করে। যেমন- অর্থের যোগান বৃদ্ধি, সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি, কর হ্রাস, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে উদ্বৃত্ত, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে অর্থনীতিতে সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি পায়।

চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মূল্যস্ফীতি হলো কেইন্সীয়ান অর্থনীতির একটি নীতি, যা সামগ্রিক চাহিদা এবং যোগানের ভারসাম্যহীনতার প্রভাব বর্ণনা করে। যখন অর্থনীতিতে পূর্ণ কর্মসংস্থান বজায় থাকে, তখন দ্রব্য ও সেবা আর উৎপাদন করা সম্ভব হয় না কারণ প্রাপ্ত সম্পদসমূহ সর্বোত্তমভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এক্ষেত্রে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের যোগান স্থির হলেও চাহিদা বাড়ছে। ফলস্বরূপ, দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে এবং মূল্যস্ফীতি বাড়ছে। পূর্ণ কর্মসংস্থানের পূর্বে সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধির মাধ্যমে দামস্তর বাড়ে। অর্থনীতিবিদ J. M. Keynes এর মতে এটি প্রকৃত মূল্যস্ফীতি নয়, এটিকে বাধাজনিত মূল্যস্ফীতি (bottleneck inflation) বলে। নিচের চিত্রের মাধ্যমে আমরা চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মূল্যস্ফীতি দেখাতে পারি-

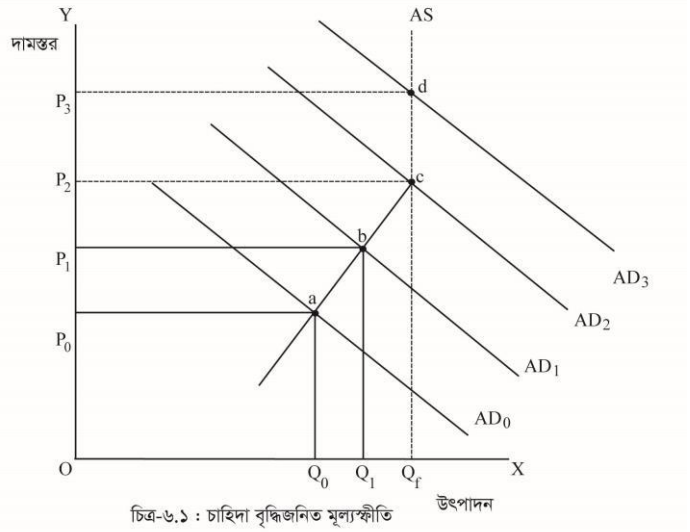

চিত্র-৬.১ : চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মূল্যস্ফীতি

চিত্র ৬.১ এ OX অক্ষে সামগ্রিক চাহিদা ও সামগ্রিক যোগান (AD & AS) এবং OY অক্ষে দামস্তর দেখানো হয়েছে। সামগ্রিক চাহিদা রেখা AD_0, a বিন্দুতে সামগ্রিক যোগান রেখা AS কে ছেদ করে। যেখানে ভারসাম্য দামস্তর P_0 এবং ভারসাম্য পরিমাণ Q_0। যখন সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি পায়, প্রাথমিক চাহিদা রেখা AD_0 ডানদিকে AD_1, AD_2 এবং AD_3

তে স্থানান্তরিত হয়, যা b, c এবং d বিন্দুতে AS রেখাকে ছেদ করে। যেখানে নতুন ভারসাম্য দামস্তর যথাক্রমে P_1, P_2 এবং P_3 । P_0 থেকে P_2 পর্যন্ত মূল্য বৃদ্ধিকে অর্ধমূল্যস্ফীতি (Semi inflation) বলা হয়। P_0 থেকে P_1 এবং P_2 এ দাম বৃদ্ধির কারণ একটি প্রদত্ত যোগান পরিস্থিতিতে দ্রব্য ও সেবার সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি। P_2 দামস্তরে এসে অর্থনীতি পূর্ণ কর্মসংস্থান স্তরে পৌঁছেছে। এখানে সামগ্রিক যোগান রেখা (AS) অক্ষের সমান্তরাল।

AD_2 থেকে AD_3 এ দামস্তর আরও বৃদ্ধি পেয়ে P_3 এ পৌঁছে। কিন্তু উৎপাদনের পরিমাণ Q_f অপরিবর্তিত অবস্থায় রয়েছে। অর্থনীতি এখানে পূর্ণ কর্মসংস্থান অবস্থানে রয়েছে। দামস্তরের এই ধরনের বৃদ্ধিকে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মূল্যস্ফীতি বলা হয়।

খরচ বৃদ্ধিজনিত মূল্যস্ফীতি

Cost push inflation

খরচ বৃদ্ধিজনিত চাপে যখন অর্থনীতিতে দ্রব্য ও সেবার সামগ্রিক যোগান কমে যায় এবং দ্রব্য ও সেবার চাহিদা অপরিবর্তিত থাকে, তখন উৎপাদন খরচ বেড়ে যায়। ফলে উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার মূল্যও বৃদ্ধি পায়। এভাবে অর্থনীতিতে যে মূল্যস্ফীতির সৃষ্টি হয় তাকে খরচ বৃদ্ধিজনিত মূল্যস্ফীতি বলে। উদাহরণস্বরূপ- যখন একটি কোম্পানির শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি বা কাঁচামালের খরচ বৃদ্ধি পায়, তখন তার উৎপাদন খরচ বেড়ে যায়। এ অবস্থায়, কোম্পানি যদি দাম না বাড়ায়, উৎপাদন খরচ বাড়লে কোম্পানির লাভ কমে যাবে। এতে করে কোম্পানির মালিক তাদের দ্রব্যের দাম বাড়িয়ে গ্রাহকদের ওপর অতিরিক্ত খরচ দেয়ার চেষ্টা করে এবং অর্থনীতিতে খরচ বৃদ্ধিজনিত মূল্যস্ফীতি ঘটে।

শ্রমিকের মজুরি বা কাঁচামালের খরচ বৃদ্ধি ছাড়াও, অন্যান্য কারণেও খরচ বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি ঘটতে পারে যেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা প্রাকৃতিক সম্পদের অবক্ষয়, যুদ্ধজনিত ব্যয় নির্বাহ, বিনিময় হারে পরিবর্তন ইত্যাদি। চিত্রের মাধ্যমে আমরা খরচ বৃদ্ধিজনিত মূল্যস্ফীতি দেখাতে পারি-

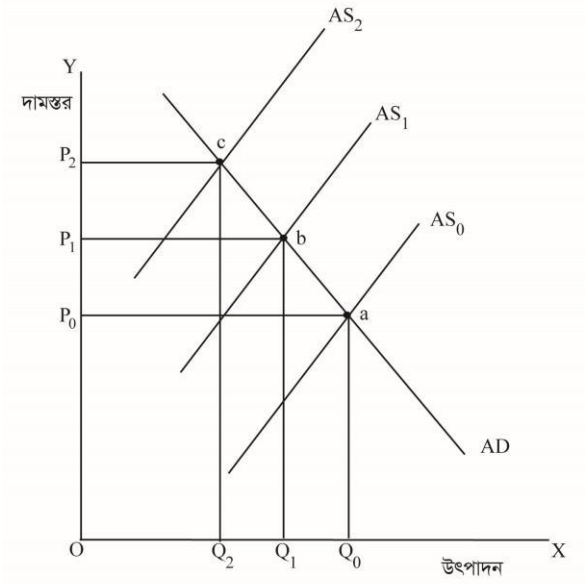

চিত্র-৬.২ : খরচ বৃদ্ধিজনিত মূল্যস্ফীতি

চিত্র ৬.২ এ OX অক্ষে সামগ্রিক চাহিদা ও সামগ্রিক যোগান এবং OY অক্ষে দামস্তর দেখানো হয়েছে। প্রাথমিক অবস্থায় সামগ্রিক চাহিদা রেখা AD সামগ্রিক যোগান রেখা AS_0 কে a বিন্দুতে ছেদ করে। এখানে ভারসাম্য দামস্তর এবং ভারসাম্য পরিমাণ যথাক্রমে P_0 এবং Q_0।

যখন কোনো কারণে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধির ফলে সামগ্রিক যোগান রেখা AS_1 ও AS_2 তে উপরের দিকে স্থানান্তরিত হয় তখন ভারসাম্য বিন্দু a থেকে পরিবর্তিত হয়ে b ও c হয়। ফলে দামস্তর P_0 থেকে বৃদ্ধি পেয়ে P_1 ও P_2 হয় এবং উৎপাদনের পরিমাণ Q_0 থেকে হ্রাস পেয়ে Q_1 ও Q_2 হয়। এভাবে সামগ্রিক চাহিদা স্থির থেকে খরচ বৃদ্ধির কারণে সামগ্রিক যোগান যদি ক্রমাগত হ্রাস পায় তবে তা মূল্যস্ফীতি সৃষ্টি করে। এরূপ মূল্যস্ফীতিকে খরচ বৃদ্ধিজনিত মূল্যস্ফীতি বলা হয়।

চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মূল্যস্ফীতি এবং খরচ বৃদ্ধিজনিত মূল্যস্ফীতির মধ্যে পার্থক্য

Difference between Demand pull Inflation and Cost push Inflation

চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মূল্যস্ফীতি এবং খরচ বৃদ্ধিজনিত মূল্যস্ফীতির মধ্যে নিম্নোক্ত পার্থক্যসমূহ পরিলক্ষিত হয়-

১। **সংজ্ঞাগত পার্থক্য:** সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধির কারণে যে মূল্যস্ফীতি ঘটে তাকে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মূল্যস্ফীতি বলে। যেখানে সামগ্রিক চাহিদা সামগ্রিক যোগানকে ছাড়িয়ে যায়। অন্যদিকে, খরচ বৃদ্ধির কারণে সামগ্রিক যোগান হ্রাস পায় এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। ফলে যে মূল্যস্ফীতি হয় তাকে খরচ বৃদ্ধিজনিত মূল্যস্ফীতি বলা হয়।

২। **কারণগত পার্থক্য:** চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মূল্যস্ফীতির প্রধান কারণ হচ্ছে অর্থের যোগান বৃদ্ধি, সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি, ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয় বৃদ্ধি, কর হার হ্রাস, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে উদ্বৃত্ত ইত্যাদি। অন্যদিকে খরচ বৃদ্ধিজনিত মূল্যস্ফীতি মজুরি বৃদ্ধি, কাঁচামালের বা অন্যান্য উপকরণের খরচ বৃদ্ধি, বিনিময় হারের পরিবর্তন ইত্যাদি কারণে ঘটে।

৩। **পূর্ণ কর্মসংস্থান সংক্রান্ত পার্থক্য:** চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মূল্যস্ফীতির ক্ষেত্রে অর্থনীতিতে পূর্ণ কর্মসংস্থান বজায় রয়েছে বলে অনুমান করা হয়। কিন্তু খরচ বৃদ্ধিজনিত মূল্যস্ফীতিতে পূর্ণ কর্মসংস্থান রয়েছে এই অনুমান করা হয় না।

৪। **বাহ্যিক উপাদান সংক্রান্ত পার্থক্য:** চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মূল্যস্ফীতির ক্ষেত্রে উৎপাদন খরচের পরিবর্তনকে স্থির ধরা হয়। এখানে বাহ্যিক উপাদানের ভূমিকা নগণ্য। অপরদিকে, খরচ বৃদ্ধিজনিত মূল্যস্ফীতিতে বাহ্যিক উপাদান যেমন বহির্বিশ্বের বিভিন্ন ঘটনা প্রভাব বিস্তার করে; উদাহরণস্বরূপ: তেলের দাম, মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতি, বিভিন্ন দেশের মধ্যকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি ইত্যাদি খরচ বৃদ্ধিজনিত মূল্যস্ফীতিতে ভূমিকা রাখে।

৬। **মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ নীতির ক্ষেত্রে পার্থক্য:** চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ আর্থিক এবং রাজস্ব নীতির সাথে যুক্ত যা বেকারত্বের উচ্চ স্তরের সাথে সম্পর্কিত। বিপরীতে, খরচ বৃদ্ধিজনিত মূল্যস্ফীতিতে নিয়ন্ত্রণ নীতি মূল্যবৃদ্ধি এবং আয় নীতির ওপর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের সাথে সম্পর্কিত, যার উদ্দেশ্য বেকারত্ব না বাড়িয়ে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা।

সারসংক্ষেপ

- **মূল্যস্ফীতি** হচ্ছে ক্রয়ক্ষমতার ক্রমান্বয় হ্রাস, যা দ্রব্য ও সেবার দামের ব্যাপক বৃদ্ধিতে প্রতিফলিত হয়।
- **চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মূল্যস্ফীতি** হলো যখন সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং যোগান একই থাকে বা হ্রাস পায়, তখন যোগান ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে পারে না। ফলে দ্রব্য ও সেবার দাম বৃদ্ধি পায়।
- **খরচ বৃদ্ধিজনিত মূল্যস্ফীতি** হলো যখন সামগ্রিক চাহিদা একই থাকে এবং উৎপাদনের উপকরণ, যেমন- শ্রম, কাঁচামাল, মূলধন ইত্যাদির ঘাটতির কারণে উৎপাদনের উপকরণের দাম বৃদ্ধি পায়। ফলে সামগ্রিক যোগান হ্রাস পায় এবং সাধারণ দামস্তরের বৃদ্ধি ঘটে।

পাঠ ৬.২ মূল্যস্ফীতির কারণ ও ফলাফল
Causes and Consequences of Inflation

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

- মূল্যস্ফীতির কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- মূল্যস্ফীতির ফলাফল বর্ণনা করতে পারবেন।

মূল্যস্ফীতির কারণ
Causes of inflation

মূল্যস্ফীতি একাধিক কারণে হতে পারে। সাধারণভাবে প্রধান দুটি কারণ হচ্ছে- চাহিদা বৃদ্ধির কারণে মূল্যস্ফীতি এবং খরচ বৃদ্ধির কারণে মূল্যস্ফীতি ।

চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মূল্যস্ফীতির কারণ
Causes of Demand-pull Inflation

১। **অর্থের যোগান বৃদ্ধি:** অর্থনীতিতে সঞ্চালিত অর্থের পরিমাণ সরাসরি মুদ্রাস্ফীতির স্তরের সাথে সম্পর্কিত। যদি অর্থের যোগান উৎপাদনের হারের চেয়ে দ্রুত বৃদ্ধি পায়, তাহলে এর ফলে মূল্যস্ফীতি দেখা যায়। অর্থের যোগান বৃদ্ধি পেলে জনগনের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। তবে যদি অর্থের যোগান বৃদ্ধির সাথে দ্রব্য ও সেবার উৎপাদন সামঞ্জস্য হারে বৃদ্ধি না পায়, তাহলে দ্রব্য ও সেবার মূল্য বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং মূল্যস্ফীতি দেখা যায়।

২। **সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি:** সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি অর্থনীতিতে অর্থের যোগান বাড়াবে। যখন সরকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন যথা- রাস্তা, ব্রিজ, স্কুল, পার্ক ইত্যাদি অবকাঠামো নির্মাণে প্রচুর পরিমাণে ব্যয় করে তখন এই প্রকল্পগুলো করার জন্য শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। এতে কর্মসংস্থান বাড়ে। এতে তাদের ক্রয়ক্ষমতা এবং ব্যয় বৃদ্ধি পায়। অর্থের যোগান বৃদ্ধি মানে মানুষের আয় বাড়বে। উচ্চ আয়ের ফলে দ্রব্য ও সেবার চাহিদা বৃদ্ধি পাবে। চাহিদা পূরণে দ্রব্য ও সেবাদি পর্যাপ্ত না থাকলে এই অতিরিক্ত চাহিদা দামস্তরকে বৃদ্ধি করবে। ফলস্বরূপ, মূল্যস্ফীতি দেখা দিবে।

৩। **করের পরিমাণ হ্রাস:** কর হ্রাস ভোক্তা এবং ব্যবসায়ীদের পকেটে আরও নগদ অর্থ জমা করবে এবং তাদের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে। ফলে দ্রব্য ও সেবার চাহিদা বৃদ্ধি পাবে। অথচ এটির সাথে সংগতি রেখে দ্রব্য ও সেবার উৎপাদন বৃদ্ধি না পেলে মূল্যস্ফীতি চাপ বাড়াবে।

৪। **ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয় বৃদ্ধি:** একটি অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে ব্যবসায়ী এবং ভোক্তারা দ্রব্য ও সেবার জন্য আরও বেশি অর্থ ব্যয় করে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পর্যায়ে চাহিদা সাধারণত দ্রব্যের যোগানকে ছাড়িয়ে যায় এবং উৎপাদকেরা তাদের উৎপাদিত দ্রব্যের দাম বাড়ায়। ফলে মূল্যস্ফীতির হার বেড়ে যায়। আবার বিনিয়োগ বৃদ্ধির কারণেও জনগণের আয় বেড়ে যায়। কিন্তু সাথে সাথে দ্রব্য ও সেবার উৎপাদন বাড়ে না। ফলে অর্থনীতিতে মূল্যস্ফীতি দেখা যায়।

৫। **উদার ঋণ নীতি:** বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ দ্বারা উদার ঋণ নীতি উচ্চ মুদ্রাস্ফীতির আরেকটি কারণ। যখন কোন দেশ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে এই নীতি গ্রহণ করে, তখন অর্থনীতিতে অর্থের যোগান বাড়ে, ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে এবং চাহিদা বাড়ে। ফলে দামস্তর বৃদ্ধি পায় এবং মূল্যস্ফীতি ঘটে।

৬। **দামস্তর আরও বৃদ্ধির সম্ভাবনা:** ক্রমবর্ধমান মূল্যস্ফীতি মানুষকে বিশ্বাস করতে বাধ্য করে যে ভবিষ্যতে দাম আবার বাড়বে, যার ফলে তারা মজুরি বৃদ্ধির দাবি করে এবং দ্রব্যাদি আরও ব্যয়বহুল হওয়ার আগেই দ্রব্যের চাহিদা বাড়িয়ে দিতে পারে। আবার, বড় বড় কোম্পানিগুলো যদি মূল্যস্ফীতি আশা করে, তাহলে তারা আসন্ন মূল্যস্ফীতির প্রত্যাশায় এবং উচ্চ মজুরি মিটমাট করার জন্য তাদের দ্রব্য ও সেবার দাম বাড়িয়ে দেয়, যা মূল্যস্ফীতিকে বাড়িয়ে তোলে।

৭। **মূল্যস্ফীতির প্রত্যাশা:** কখনও কখনও, যদি একটি দেশের ভোক্তারা মূল্যস্ফীতির আশা করেন, তাহলে তারা আরও ব্যয়বহুল হওয়ার আগেই দ্রব্যের চাহিদা বাড়িয়ে দিতে পারে। আবার, বড় বড় কোম্পানি যদি মূল্যস্ফীতি আশা করে, তাহলে তারা আসন্ন মূল্যস্ফীতির প্রত্যাশায় তাদের দ্রব্য ও সেবার দাম বাড়িয়ে দেয়। যা দেশে মূল্যস্ফীতি ঘটায়।

৮। **সুদের হার হ্রাস:** যদি ভোক্তা এবং ব্যবসা প্রতিষ্টানগুলো খুব কম হারে অর্থ ধার করতে পারে এবং সঞ্চয়ে কম সুদের হার পায়, তাহলে তাদের সঞ্চয় করার পরিবর্তে অর্থ ব্যয় করার সম্ভাবনা বেশি থাকবে। এটি স্বাভাবিকভাবেই জনগণের চাহিদা বাড়ায়। ফলে দ্রব্যাদির দাম বৃদ্ধি পায়। যা একটি মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধিমূলক ঘটনা।

৯। **কর হ্রাস:** অনেক সময় জনকল্যাণ বৃদ্ধি করার জন্য সরকার কর হ্রাস করে থাকে। এর ফলে তখন জনগণের হাতে বেশি অর্থ থাকে। অর্থাৎ তাদের ব্যয়যোগ্য অর্থের পরিমাণ বেড়ে যায়। যার ফলে সামগ্রিক চাহিদা (অর্থাৎ একটি অর্থনীতিতে উৎপাদিত সমস্ত দ্রব্য এবং সেবার চাহিদার মোট পরিমাণ) বৃদ্ধি পায়। অথচ এর সাথে সংগতি রেখে দ্রব্য এবং সেবার উৎপাদন বৃদ্ধি পায় না। যা মূল্যস্ফীতি আকারে প্রকাশ পায়।

১০। **আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে উদ্বৃত্ত:** কোনো দেশে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে উদ্বৃত্ত বলতে বোঝায় ঐ দেশের দ্রব্য এবং সেবার জন্য বিদেশে উচ্চ চাহিদা রয়েছে, যা দেশটির জনগণের আয় ও ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। তবে দেশটির দ্রব্য এবং সেবার উৎপাদন যদি অপরিবর্তিত থাকে, তখন দেশটিতে মূল্যস্ফীতি ঘটে ।

১১। **বেতনকাঠামো পরিবর্তন:** সরকার যখন সব সরকারি কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি করে তখন অর্থের যোগান বেড়ে গিয়ে সামগ্রিক বাজারমূল্যের স্তর বৃদ্ধি পায়। যা মূল্যস্ফীতি সৃষ্টি করে।

১২। **বৈদেশিক ঋণ ও অনুদান:** দেশে যদি অধিক হারে বিদেশি ঋণ, অনুদান আসে তাহলে অর্থনীতিতে আয় বাড়ে, আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে জনগণের ভোগ ব্যয় বৃদ্ধির প্রবণতা বাড়ে। ব্যয় বৃদ্ধির সাথে সাথে দ্রব্য ও সেবার চাহিদা বাড়ে। কিন্তু স্বল্পকালীন সময়ে দ্রব্যের সরবরাহ সে অনুপাতে বাড়ে না। ফলে দামস্তর বৃদ্ধি পায়। আবার বিদেশি ঋণ যদি অস্ত্রশস্ত্র এবং সামরিক যুদ্ধের উপকরণ ক্রয়ের মতো অনুৎপাদনশীল উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়, তবে তা অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর, কারণ ঋণের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধির কারণে চাহিদা বাড়ে এবং দাম বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এতে করে অর্থনীতিতে কোনো উৎপাদনশীল দ্রব্য বা সম্পদ সৃষ্টি হয় না। ফলে মূল্যস্ফীতি দেখা যায়।

খরচ বৃদ্ধিজনিত মূল্যস্ফীতির কারণ

Causes of Cost push Inflation

১। **মজুরি বৃদ্ধি:** শ্রমের দাম বাড়লে অর্থাৎ মজুরি বৃদ্ধি পেলে, শ্রম দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্যের দামও বাড়তে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যদি শ্রমিকদের মজুরি কম দেওয়া হয়, তখন উৎপাদন ব্যয় কমে যায়, এ কারণে দ্রব্য ও সেবার দাম কম থাকে। যদি শ্রমিকরা মজুরির জন্য সংগঠিত হয় এবং শ্রমের ব্যয় বেড়ে যায়, তখন উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যায়, যা দ্রব্য ও সেবার দাম বৃদ্ধি করে। এর ফলে মূল্যস্ফীতি দেখা যায়।

২। **কাঁচামালের খরচ:** কখনও কখনও কাঁচামালের দাম বেড়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, যখন গ্যাস বেশি ব্যয়বহুল হয়, কোম্পানিগুলোকে তাদের দ্রব্য আশেপাশে পাঠানোর জন্য আরও বেশি অর্থ প্রদান করতে হয়, তাই তারা তাদের দ্রব্যের দাম বাড়ায়। আবার যদি সুতার দাম বৃদ্ধি পায় তাহলে কাপড় তৈরিতে খরচ বেড়ে যায়। ফলে কাপড়ের দাম বৃদ্ধি পায়, যা মূল্যস্ফীতি আকারে প্রকাশ পায়।

৩। **অপ্রত্যাশিত উৎপাদন বাধা:** যদি কোনো দেশে বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসলহানি অথবা কলকারখানার উৎপাদন ব্যাহত হয় এবং দেশে যদি অর্থের যোগান অপরিবর্তিত থাকে, তাহলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায় এবং স্বল্পকালে মূল্যস্ফীতি দেখা যায়।

৪। **যুদ্ধজনিত ব্যয় নির্বাহ:** যেকোনো দেশে যুদ্ধের সময় সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি পায়। সরকার তখন বাধ্য হয়ে কাগজী নোট ছাপায়। অন্যদিকে যুদ্ধের সময় একটি দেশের উৎপাদন ব্যবস্থা ব্যাহত হয়। ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায় এবং মূল্যস্ফীতি দেখা যায়।

৫। **মজুতদারি ও চোরাচালান:** কিছু অসাধু ব্যবসায়ী দ্রব্য মজুদ করে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে এবং দাম বাড়ায়। আবার কিছু অসাধু ব্যবসায়ী দ্রব্যসামগ্রী পাচার করে ঘাটতি তৈরি করে। ফলস্বরূপ, মূল্যস্ফীতি দেখা যায়।

৬। **বিনিময় হার:** বিনিময় হারের গতিবিধিও দামকে প্রভাবিত করতে পারে। যদি দেশীয় মুদ্রার মূল্য হ্রাস পায়- অর্থাৎ, মুদ্রার অবমূল্যায়ন ঘটে, তখন দুটি উপায়ে মূল্যস্ফীতি সৃষ্টি হয়। প্রথমত, বিদেশে উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার দাম অভ্যন্তরীণভাবে উৎপাদিত দ্রব্যের তুলনায় বেড়ে যায়। ফলস্বরূপ, ভোক্তারা একই আমদানিকৃত দ্রব্য কিনতে পূর্বের চেয়ে বেশি অর্থ প্রদান করে এবং দ্বিতীয়ত, যেসব প্রতিষ্ঠান তাদের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় আমদানিকৃত কাঁচামালের ওপর নির্ভর করে তারা তখন এই উপকরণগুলো কিনতে বেশি অর্থ প্রদান করে। এভাবে আমদানিকৃত দ্রব্য ও সেবার মূল্য বৃদ্ধি খরচ বৃদ্ধিজনিত মূল্যস্ফীতি ঘটায়।

মূল্যস্ফীতির ফলাফল

Consequence of Inflation

১। আয় এবং সম্পদ বণ্টনের উপর প্রভাব

মূল্যস্ফীতি অর্থনীতির বিভিন্ন শ্রেণির ব্যক্তিদের মধ্যে অসম প্রভাব ফেলে। কিছু শ্রেণির মানুষ লাভবান হয় এবং কিছু শ্রেণির মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় ।

(ক) ঋণদাতা এবং ঋণগ্রহীতা: মূল্যস্ফীতি হলে ঋণদাতা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। কারণ স্বাভাবিক সময়ে ঋণ দেয়ার ফলে অর্থের মূল্য বেশি ছিল। কিন্তু মূল্যস্ফীতির সময় তারা সমান পরিমাণ অর্থ ফেরত পেলেও তা দ্বারা আগের চেয়েও কম পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করতে পারে। কারণ তখন অর্থের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়। অন্যদিকে, ঋণগ্রহীতার মূল্যস্ফীতির সময় লাভবান হয় যেহেতু তারা অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয় করে সমান পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে পারে। কেননা দ্রব্যসামগ্রীর আকারে তাদের কম পরিশোধ করতে হয়।

(খ) উৎপাদক এবং শ্রমিক: মূল্যস্ফীতির সময় উৎপাদকেরা লাভ করে কারণ যেহেতু দাম বৃদ্ধি সাধারণত খরচ বৃদ্ধির চেয়ে বেশি হয়, ফলে তাদের দ্রব্যাদি বিক্রয় থেকে বেশি লাভ হয়। তাই উৎপাদকরা মুদ্রাস্ফীতির সময় আরও বেশি উপার্জন করতে পারে। কিন্তু শ্রমিকরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়, কারণ যেহেতু তাদের আর্থিক মজুরি সাধারণত দাম বৃদ্ধির সাথে আনুপাতিকভাবে বাড়ে না, ফলে তাদের প্রকৃত মজুরি হ্রাস পায়। । তবে তারা একটি শ্রেণি হিসেবে লাভবান হয় কারণ মূল্যস্ফীতির সময় উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়।

(গ) স্থির আয় উপার্জনকারী: স্থির আয় উপার্জনকারীরা, যেমন বেতনভোগী মানুষ, বাড়িওয়ালা, পেনশনভোগী ইত্যাদি জনগণ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় কারণ মূল্যস্ফীতি তাদের উপার্জনের মূল্য হ্রাস করে। দ্রব্যমূল্য বাড়লেও তাদের আয় বাড়ে না। ফলে তাদের জীবনযাত্রার মান হ্রাস পায়।

(ঘ) বিনিয়োগকারী: শেয়ারে যারা অর্থ বিনিয়োগ করে তারা মূল্যস্ফীতিতে লাভবান হয়। কারণ মূল্যস্ফীতির সময় শেয়ার ও মূলধন সম্পদের মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং বৃহত্তর কর্পোরেট মুনাফার কারণে তারা উচ্চ হারে লভ্যাংশ পায়। অপরদিকে যারা নির্দিষ্ট সুদ লাভের জন্য সরকারি সঞ্চয়পত্র, বন্ড ও ডিবেঞ্চারে অর্থ বিনিয়োগ করে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ মূল্যস্ফীতিতে সুদের প্রকৃত মূল্য হ্রাস পায়।

(ঙ) কৃষকশ্রেণি: মূল্যস্ফীতির সময় কৃষকরাও লাভবান হয় কারণ উৎপাদন খরচের তুলনায় কৃষিদ্রব্যের দাম বেশি বৃদ্ধি পায়। তবে ভূমিহীন ক্ষেতমজুর ও ক্ষুদ্র কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ তাদেরকে স্বল্প আয়ে দ্রব্যসামগ্রী অধিক দামে ক্রয় করতে হয়।

(চ) মজুতদার, ফটকা ব্যবসায়ী এবং কালোবাজারি: এই শ্রণির মানুষ মূল্যস্ফীতির সময় মুনাফা করে। কারণ তারা দ্রব্যাদি মজুত করে দুষ্প্রাপ্যতাকে বাড়িয়ে তোলে। ফলে দাম আরও বাড়তে থাকে এবং এভাবে দামের ক্রমাগত বৃদ্ধি থেকে বেশি মুনাফা লাভ করে।

(ছ) করদাতা ও করগ্রহীতা: মূল্যস্ফীতির সময় করদাতারা লাভবান হয়। কারণ অর্থের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ায় দ্রব্যসামগ্রীর হিসেবে তাদেরকে কম সম্পদ ত্যাগ করতে হয়। কিন্তু করগ্রহীতা হিসেবে সরকার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ সরকার কর হতে যে পরিমাণ রাজস্ব আয় পায় মূল্যস্ফীতির সময় ইহার প্রকৃত মূল্য কমে যায়।

এইভাব মূল্যস্ফীতি দেশে আয় ও সম্পদের বণ্টনের ধরনে পরিবর্তন আনে, সাধারণত ধনীকে আরও ধনী এবং দরিদ্রকে আরও দরিদ্র করে তোলে। ফলস্বরূপ, মূল্যস্ফীতির সময় আয় বণ্টনে আরও বেশি বৈষম্য দেখা দেয়।

২। উৎপাদন, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের উপর প্রভাব

মৃদু মূল্যস্ফীতির হার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে উদ্দীপিত করে। মূল্য স্তরের বৃদ্ধি প্রাথমিকভাবে উৎপাদকের মুনাফা বৃদ্ধি করে যা পরবর্তীতে বিনিয়োগ, উৎপাদন, কর্মসংস্থান এবং আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। উৎপাদকরা যত বেশি মুনাফা পায়, তারা তাদের হাতে থাকা সমস্ত উপলব্ধ সম্পদ ব্যবহার করে আরও বেশি উৎপাদন করার চেষ্টা করে। ফলে পূর্ণ কর্মসংস্থান স্তরে না পৌঁছা পর্যন্ত উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়। তবে, উচ্চ মূল্যস্ফীতির ফলে অর্থের মূল্য হ্রাস পায় এবং ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়। ফলস্বরূপ, সঞ্চয় এবং মূলধন গঠন হ্রাস পায়, যা উদ্যোক্তাদের উৎপাদনের সাথে জড়িত ঝুঁকি নিতে নিরুৎসাহিত করে। এটি উৎপাদনের মানের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে এবং মুনাফা অর্জনের জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের উৎপাদন থেকে সম্পদ সরিয়ে অপ্রয়োজনীয় পণ্যের উৎপাদনে নেওয়া হয়। তাছাড়া, এ সময় উৎপাদক ও কৃষকরা আরও দাম বাড়ার আশায় দ্রব্যাদির মজুদ বাড়াতে থাকেন।

উৎপাদনের উপর মুদ্রাস্ফীতির বিরূপ প্রভাব নিচে আলোচনা করা হলো:

(ক) সম্পদের অপব্যবহার: মূল্যস্ফীতি সম্পদের ভুল বণ্টন ঘটায় যখন উৎপাদকেরা সম্পদকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন থেকে সরিয়ে অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদনে কাজে লাগায় যেখান থেকে তারা উচ্চ মুনাফা আশা করে।

(খ) উৎপাদন হ্রাস: মূল্যস্ফীতি উৎপাদনের পরিমাণকে বিরূপভাবে প্রভাবিত করে। কারণ উপকরণসমূহের ক্রমবর্ধমান ব্যয় বৃদ্ধির সাথে দাম বৃদ্ধির প্রত্যাশা অনিশ্চয়তা নিয়ে আসে। এতে উৎপাদন কমে যায়।

(গ) গুণমান হ্রাস: ক্রমাগত দাম বৃদ্ধি একটি বিক্রেতার বাজার তৈরি করে। এই পরিস্থিতিতে উৎপাদকেরা উচ্চ মুনাফা অর্জনের জন্য নিম্নমানের দ্রব্য উৎপাদন এবং বিক্রি করে।

(ঘ) মজুতদারি ও কালোবাজারি: ক্রমবর্ধমান দাম থেকে আরও লাভের জন্য উৎপাদকেরা তাদের দ্রব্য মজুত করে। ফলে বাজারে দ্রব্যের কৃত্রিম সংকট তৈরি হয়। তারপর উৎপাদকরা তাদের দ্রব্য কালোবাজারে বেশি দামে বিক্রি করে, যা মূল্যস্ফীতির চাপ বাড়ায়।

(ঙ) সঞ্চয় হ্রাস: যখন দাম দ্রুত বৃদ্ধি পায়, তখন সঞ্চয় প্রবণতা হ্রাস পায়। কারণ দ্রব্য এবং সেবা ক্রয়ে আগের তুলনায় আরও বেশি অর্থের প্রয়োজন হয়। হ্রাসকৃত সঞ্চয় বিনিয়োগ এবং মূলধন গঠনে বিরূপ প্রভাব ফেলে। ফলে উৎপাদন ব্যাহত হয়।

(চ) বিদেশি পুঁজিকে নিরুৎসাহিত করে: মূল্যস্ফীতি বিদেশি পুঁজির প্রবাহকে বাধা দেয়, কারণ কাঁচামাল এবং অন্যান্য উপকরণের ক্রমবর্ধমান ব্যয় বিদেশি বিনিয়োগকে কম লাভজনক করে তোলে।

(ছ) অনুমানকে উৎসাহিত করে: মূল্যস্ফীতিতে ক্রমবর্ধমান দাম উৎপাদকদের মধ্যে অনিশ্চয়তা তৈরি করে। যা তাদেরকে দ্রুত মুনাফা অর্জনের জন্য অনুমানমূলক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়। উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে নিজেদের নিয়োজিত করার পরিবর্তে তারা উৎপাদনে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ধরনের কাঁচামাল নিয়ে অনুমান করে।

৩। ব্যবসায় ও বাণিজ্যের উপর প্রভাব

মৃদু মূল্যস্ফীতির সময় উচ্চ আয়, অধিক উৎপাদন এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধির কারণে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের সামগ্রিক পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে, দেশীয় দ্রব্যের দাম বৃদ্ধির কারণে রপ্তানি বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তবে, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ বৃহত্তর মুনাফা অর্জনের জন্য তাদের ব্যবসা প্রসারিত করে। বেশিরভাগ মূল্যস্ফীতির সময় যেহেতু খরচ দামের মতো দ্রুত বৃদ্ধি পায় না ফলে মুনাফা বৃদ্ধি পায় । কিন্তু মজুরি দামের সাথে আনুপাতিক হারে বাড়ে না, যা শ্রমিকদের কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং সমাজে আরও বেশি বৈষম্য তৈরি করে।

৪। সরকারি আয়-ব্যয়ের উপর প্রভাব

মূল্যস্ফীতির সময়, আয়কর, বিক্রয় কর, ভ্যাট, আবগারি শুল্ক ইত্যাদি থেকে বেশি রাজস্ব পাওয়ায় সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি পায়। একইভাবে, প্রশাসনিক এবং অন্যান্য উদ্দেশ্যে সরকারকে বেশি বেশি ব্যয় করতে হয় বলে সরকারি ব্যয়ও বৃদ্ধি পায়। আবার ক্রমবর্ধমান মূল্য সরকারি ঋণের প্রকৃত বোঝা হ্রাস করে কারণ প্রতি পিরিয়ড কিস্তিতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে হয়। অর্থাৎ ঋণ পরিশোধের জন্য সরকারকে পূর্বের চেয়ে কম পরিমাণ প্রকৃত সম্পদ ব্যয় করতে হয়।

৫। সামাজিক প্রভাব

মূল্যস্ফীতির প্রাথমিক পর্যায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে উৎসাহিত করে, কিন্তু অব্যাহত মূল্যস্ফীতি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করে। কারণ এটি উন্নয়ন প্রকল্পের খরচ বাড়ায়। এ সময় ধনী শ্রেণি অপেক্ষা দরিদ্র শ্রেণি অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সমাজে আয় বৈষম্য বেড়ে যায়। ফলে সামাজিক অসন্তোষ ও বিশৃঙ্খলা দেখা যায় এবং সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটে।

সারসংক্ষেপ

- মূল্যস্ফীতির প্রধান কারণগুলো হচ্ছে-

  চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মূল্যস্ফীতি: সামগ্রিক চাহিদা যখন সামগ্রিক যোগানের চেয়ে দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

  খরচ বৃদ্ধিজনিত মূল্যস্ফীতি: উৎপাদনের উপকরণগুলোর দাম বৃদ্ধির কারণে যখন উৎপাদন খরচ বেড়ে যায় এবং সামগ্রিক উৎপাদন কমে যায়।

  মুদ্রার অবমূল্যায়ন: দেশীয় মুদ্রার মূল্য হ্রাস পেলে বিদেশে উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার দাম অভ্যন্তরীণভাবে

  উৎপাদিত দ্রব্যের তুলনায় বেড়ে যায়।

  ক্রমবর্ধমান মজুরি: উচ্চ মজুরি উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের খরচ বৃদ্ধি করে।

  মূল্যস্ফীতি প্রত্যাশা: উচ্চ মূল্যস্ফীতির প্রত্যাশা শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির দাবিকে ত্বরান্বিত করে এবং উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের খরচ বাড়ায়।

- মূল্যস্ফীতি অর্থনীতির বিভিন্ন শ্রেণির ব্যক্তিদের মধ্যে অসম প্রভাব ফেলে। এতে কিছু শ্রেণির মানুষ লাভবান হয় এবং কিছু শ্রেণির মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় । যেমন-

  উৎপাদন, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের উপর প্রভাব: মৃদু মুদ্রাস্ফীতি সাধারণত পণ্য উৎপাদকদের উপকার করে। কারণ তারা তাদের পণ্য বেশি দামে বিক্রি করতে পারে বলে তারা ভালো মুনাফা অর্জন করে। তাছাড়া এ সময় বিনিয়োগকারী এবং উদ্যোক্তারা উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগের জন্য অতিরিক্ত প্রণোদনা পান। ফলে উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি পায় এবং কর্মসংস্থান বাড়ে।

  আয় ও সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য বৃদ্ধি পায়: ঋণগ্রহীতাদের সুবিধা হয় এবং ঋণদাতারা লোকসানের মুখে পড়ে। স্থির-আয় উপার্জনকারীদের আয় কমে যায়। করদাতা লাভবান হলেও করগ্রহীতা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। শেয়ার বাজারে বিনিয়োগকারী ও ফটকা ব্যবসায়ী লাভবান হয় কিন্তু শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণি ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

  সরকারি আয়-ব্যয়ের উপর প্রভাব: একদিকে সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি পায় অন্যদিকে সরকারের ব্যয়ও বৃদ্ধি পায়।

  সামাজিক প্রভাব: মূল্যস্ফীতির প্রাথমিক পর্যায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে উৎসাহিত করে। কিন্তু অব্যাহত মূল্যস্ফীতি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করে। ফলে সামাজিক অসন্তোষ ও বিশৃঙ্খলা দেখা যায় এবং সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটে।

পাঠ ৬.৩ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ
Inflation Control

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

- মূল্যস্ফীতির নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি
Method of Controlling Inflation

যেকোনো অর্থনীতির জন্য মূল্যস্ফীতি একটি জটিল ঘটনা। যদিও মৃদু মূল্যস্ফীতি সাধারণত একটি অর্থনীতির জন্য ভালো, তবে এটি যখন এর বাইরে যায়, তখন এটি অর্থনীতির জন্য একটি বিপর্যয়কর পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা নিম্নরূপ:

(১) আর্থিক ব্যবস্থা, (২) রাজস্ব ব্যবস্থা এবং (৩) অন্যান্য ব্যবস্থা। আমরা প্রথমে জন্য আর্থিক ও রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যবস্থাগুলো আলোচনা করবো।

আর্থিক ব্যবস্থা
Monetary Measures

একটি দেশের আর্থিক নীতিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জড়িত:

(ক) **ব্যাংক হার বৃদ্ধি:** মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত সর্বাধিক ব্যবহৃত পরিমাপগুলোর একটি হচ্ছে ব্যাংক হার বৃদ্ধি। ব্যাংক হার হলো যে হারে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংককে ঋণ দিয়ে থাকে। ব্যাংক হার বৃদ্ধি পেলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো জনসাধারণের জন্য ঋণের ওপর তাদের সুদের হার বৃদ্ধি করে। এমন পরিস্থিতিতে, জনগণ বিনিয়োগের পরিবর্তে অর্থ সঞ্চয় করতে পছন্দ করে। ফলস্বরূপ, বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণের পরিমাণ কমে এবং বাজারে অর্থের যোগান হ্রাস পেয়ে দামস্তর হ্রাস পায়, যা মূল্যস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

(খ) **খোলা বাজার নীতি:** বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ সৃষ্টির ক্ষমতা কমাতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক খোলাবাজার কার্যক্রমের মাধ্যমে ঋণপত্র ও সঞ্চয়পত্র বিক্রয় করে জনগণ ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের নিকট থেকে নগদ অর্থ তুলে নিতে পারে। ফলে বাণিজ্যিক ব্যাকের সাধারণ মানুষের জন্য ঋণ প্রদান ক্ষমতা হ্রাস পায়। ফলে অর্থের যোগান কমে এবং দামস্তর হ্রাস পায়।

(গ) **রিজার্ভ অনুপাত পরিবর্তন:** বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ সৃষ্টির ক্ষমতা কমাতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক নগদ রিজার্ভ অনুপাত বৃদ্ধি করে। ফলস্বরূপ, বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকে তাদের মোট আমানত থেকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে প্রচুর পরিমাণে নগদ অর্থ সংরক্ষণ করতে হবে। এতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণ দেওয়ার ক্ষমতা কমে যায় এবং মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যবস্থা
Fiscal Measures

মুদ্রানীতি ছাড়াও সরকার মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য রাজস্ব নীতি ব্যবহার করে। রাজস্ব নীতির দুটি প্রধান উপাদান হলো সরকারি রাজস্ব এবং সরকারি ব্যয়। রাজস্ব নীতিতে, সরকার হয় ব্যক্তিগত ভোগ ব্যয় হ্রাস করে বা সরকারি ব্যয় হ্রাস করে বা উভয় ব্যবহার করে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করে। প্রধান রাজস্ব ব্যবস্থাসমূহ নিম্নরূপ:

সরকারি ব্যয় হ্রাস: দেশের মোট ব্যয়ের একটি বড় অংশ হচ্ছে সরকারি ব্যয়। মূল্যস্ফীতি রোধে সরকারের উচিত অনুন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় কমানো। এর ফলে অর্থনীতিতে আর্থিক আয় প্রবাহ কমবে। আয় কমলে সামগ্রিক চাহিদা হ্রাস পায় এবং মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

কর বৃদ্ধি: ব্যক্তিগত ভোগ ব্যয় কমাতে ব্যক্তিগত, কর্পোরেট এবং দ্রব্য করের হার বাড়াতে হবে এবং এমনকি নতুন কর আরোপ করতে হবে। এতে জনগণের হাতে ব্যয়যোগ্য আয়ের পরিমাণ কমে যাবে এবং মোট ব্যয়ের পরিমাণ কমে যায়। কিন্তু কর হার এত বেশি হওয়া উচিত নয় যাতে সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও উৎপাদন নিরুৎসাহিত হয়। বরং যারা সঞ্চয় করে, বিনিয়োগ করে এবং বেশি উৎপাদন করে তাদের জন্য কর ব্যবস্থায় আরও বড় প্রণোদনা দেওয়া উচিত। তাছাড়া, কর রাজস্ব সংগ্রহে সরকারের উচিত কর ফাঁকি দেয়া ব্যক্তিদের ওপর জরিমানা আরোপ করা। দেশের অভ্যন্তরে দ্রব্যের যোগান বাড়াতে আমদানি শুল্ক কমিয়ে রপ্তানি শুল্ক বাড়াতে হবে। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে এ ধরনের পদক্ষেপ কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

সঞ্চয় বৃদ্ধি: মূল্যস্ফীতি রোধে আরেকটি রাজস্ব ব্যবস্থা হলো জনগণের সঞ্চয় বাড়ানো। এটি ব্যক্তিগত ভোগ ব্যয় হ্রাসের মাধ্যমে জনগণের ব্যয়যোগ্য আয় হ্রাস করবে। কিন্তু জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের কারণে, মানুষ তখন স্বেচ্ছায় খুব বেশি সঞ্চয় করার অবস্থানে থাকে না। কেইনস, তাই বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের পক্ষে ছিলেন যাকে তিনি 'বিলম্বিত অর্থ প্রদান' বলে অভিহিত করেছেন। এর মাধ্যমে সঞ্চয়কারী কয়েক বছর পরে তার অর্থ ফেরত পায়। এই উদ্দেশ্যে সরকার সুদের হার বাড়ানো, সঞ্চয় স্কিম শুরু করা বা দীর্ঘ সময়ের জন্য লটারি ইত্যাদি ব্যবস্থা নিতে পারে। তাছাড়া বাধ্যতামূলক ভবিষ্য তহবিলের সাথে পেনশন পরিকল্পনা ইত্যাদি বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। এই ধরনের পদক্ষেপগুলি জনগণের সঞ্চয় বাড়ায় এবং মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ভূমিকা রাখে।

উদ্বৃত্ত বাজেট: সরকার কর্তৃক মূল্যস্ফীতি বিরোধী বাজেট নীতি গ্রহণ মাধ্যমে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। এই উদ্দেশ্যে, সরকারের উচিত ঘাটতি অর্থায়ন ছেড়ে দেওয়া এবং পরিবর্তে উদ্বৃত্ত বাজেট রাখা। এর ফলে রাজস্ব বেশি সংগ্রহ হবেএবং ব্যয় কম হবে।

সরকারি ঋণ: সরকার কর্তৃক জনগণ থেকে যে ঋণ নেয়া হয় মূল্যস্ফীতির সময়ে মূল্যস্ফীতির চাপ নিয়ন্ত্রণ না হওয়া পর্যন্ত ভবিষ্যতের কিছু সময়ের জন্য সরকারি ঋণের পরিশোধ স্থগিত রাখা উচিত। পরিবর্তে জনগণের নিকট হতে বিভিন্ন মেয়াদি ঋণ গ্রহণ করে উদ্বৃত্ত আয় কমাতে পারে। ফলে ক্রয়ক্ষমতা ও অর্থের যোগান হ্রাস পায় এবং মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

অন্যান্য ব্যবস্থা

Other Measures

আর্থিক ও রাজস্ব ব্যবস্থা ছাড়া অন্যান্য যেসব নীতি মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করতে পারে তা নিচে আলোচনা করা হলো—

উৎপাদন বৃদ্ধি: মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের অন্যতম প্রধান পদক্ষেপ হলো খাদ্য, পোশাক, উদ্ভিজ্জ তেল, চিনি, কেরোসিন তেল ইত্যাদির মতো প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা। যদি দেশে অব্যবহৃত প্রাকৃতিক সম্পদ থাকে তবে সেগুলো ব্যবহার করে উৎপাদন বাড়ানো যায়। প্রয়োজন হলে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য এই জাতীয় দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আমদানি করা যেতে পারে।

মজুরি নিয়ন্ত্রণ: যদি মজুরি বৃদ্ধির কারণে মূল্যস্ফীতি ঘটে (যেমন শক্তিশালী শ্রমিক সংঘগুলো উচ্চতর প্রকৃত মজুরির জন্য দর কষাকষি করে), তাহলে মজুরি বৃদ্ধি সীমিত করে মূল্যস্ফীতির মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। স্বল্প মজুরি বৃদ্ধি শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করবে এবং অর্থনীতিকে কম অতিরিক্ত চাহিদার দিকে পরিচালিত করবে।

দাম নিয়ন্ত্রণ ও রেশনিং: দাম নিয়ন্ত্রণ এবং রেশনিং হলো মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সরকার কর্তৃক সরাসরি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। দাম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যদ্রব্যের দামের ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারণ করা হয়। যেখানে কেউ এই দামের চেয়ে বেশি দাম নিলে আইন দ্বারা শাস্তি দেওয়া হয়। 'রেশনিং' শব্দটি ক্রমবর্ধমান দামস্তর বৃদ্ধির সময়ে কিছু প্রয়োজনীয় দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য, যেমন- চাল, গম, ডাল, কাপড়, চিনি ইত্যাদির ব্যবহারে বিধিনিষেধ আরোপকে বোঝায়। অর্থাৎ রেশনিং হচ্ছে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের সীমিত যোগান ভাগ করে নেওয়ার একটি 'ন্যায্য' উপায় যখন সবাই একটি নির্দিষ্ট দামে একই পরিমাণ দ্রব্য পায়। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে দাম নিয়ন্ত্রণ পরিচালনা করা যেমন কঠিন, তেমনি রেশনিং ব্যবস্থায় দীর্ঘ লাইন, কাল্পনিক ঘাটতি, দুর্নীতি এবং কালোবাজারির সুযোগ সৃষ্টি করে, যা ভোক্তাদের জন্য খুবই অসুবিধাজনক।

মূল্যস্ফীতি প্রত্যাশা হ্রাস: মূল্যস্ফীতির আরেকটি নির্ধারক হচ্ছে মূল্যস্ফীতি প্রত্যাশা। যদি জনগণ আগামী বছর মূল্যস্ফীতির আশা করে, তাহলে শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো উৎপাদিত দ্রব্যের দাম বাড়িয়ে দেবে এবং শ্রমিকরা উচ্চ মজুরি দাবি করবে। এই

প্রত্যাশা উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণ হতে থাকে। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং সরকার মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বিশ্বাসযোগ্য প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রত্যাশা কমাতে পারে, তাহলে এটি মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের কাজটি সহজ করে দেয়।

প্রচলিত মুদ্রা বাতিল: অতি মূল্যস্ফীতির সময়ে প্রচলিত নীতিগুলি অনুপযুক্ত হতে পারে। ভবিষ্যতের মূল্যস্ফীতির প্রত্যাশা পরিবর্তন করা কঠিন হতে পারে। যখন একটি দেশের জনগণ ঐ দেশের মুদ্রার প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে, তখন সরকার কর্তৃক নতুন মুদ্রা প্রবর্তন করা বা ডলারের মতো অন্য একটি মুদ্রা ব্যবহার করা প্রয়োজন হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ২০০৮ সালে জিম্বাবুয়ে অতি মূল্যস্ফীতির সময়ে সরকার জিম্বাবুয়ান ডলার মুদ্রণ বন্ধ করে দেয় এবং মার্কিন ডলার ব্যবহার করা শুরু করে।

বিনিময় হার নীতি: একটি দেশ একটি নির্দিষ্ট বিনিময় হার ব্যবস্থায় যোগ দিয়ে মূল্যস্ফীতির চাপ কম রাখতে পারে। যদি একটি মুদ্রার মান স্থির (বা আধা স্থির) হয় তবে এটি মূল্যস্ফীতি কম রাখার জন্য একটি শৃঙ্খলা তৈরি করে।

সারসংক্ষেপ

প্রধানত তিনটি উপায়ে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়: (১) আর্থিক ব্যবস্থা; (২) রাজস্ব ব্যবস্থা; এবং (৩) অন্যান্য ব্যবস্থা।

- **আর্থিক নীতির** মাধ্যমে ঋণ নিয়ন্ত্রণ, কেন্দ্রীয় ব্যাংকে রিজার্ভ অনুপাত বৃদ্ধি করে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। আর্থিক নীতি একাই মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে যথেষ্ট নয়। অতএব, এটি রাজস্ব নীতি দ্বারা সম্পূরক করা উচিত।
- যখন সামগ্রিক চাহিদা সামগ্রিক যোগানের চেয়ে বেশি হয় তখন মূল্যস্ফীতি ঘটে। সরকারি ব্যয়, ব্যক্তিগত ভোগ ব্যয় এবং ব্যক্তিগত ও সরকারি বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণের জন্য **রাজস্ব নীতি** অত্যন্ত কার্যকর। ফলে অর্থনীতিতে আর্থিক আয় প্রবাহ কমবে। আয় কমলে সামগ্রিক চাহিদা হ্রাস পায় এবং মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আসে।
- তাছাড়া মজুরি ও দাম নিয়ন্ত্রণ, উৎপাদন বৃদ্ধি, বিনিময় হার নীতি ইত্যাদি অন্যান্য ধরনের ব্যবস্থার মাধ্যমে সামগ্রিক যোগান বৃদ্ধি এবং সামগ্রিক চাহিদা হ্রাস করে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।

পাঠ ৬.৪ বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি
Inflation in Bangladesh

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

- বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতির কারণ বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতির প্রভাব বর্ণনা করতে পারবেন।

সাধারণত, অর্থনৈতিক তত্ত্ব অনুযায়ী উন্নত দেশগুলোতে পূর্ণ কর্মসংস্থানের পরে মূল্যস্ফীতি ঘটে। তবে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে, কিছু সম্পদ অব্যবহৃত থাকা অবস্থায় মুল্যস্ফীতি দেখা যায় । বাংলাদেশও ইহার ব্যতিক্রম নয়। একটি উন্নয়নশীল দেশে মূলধনের অভাব, অনুন্নত প্রযুক্তি, ত্রুটিপূর্ণ উৎপাদন ব্যবস্থা এবং সঠিক পরিকল্পনার অভাবে মূল্যস্ফীতি ঘটে। বাংলাদেশও এসব সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং মূল্যস্ফীতি ঘটে। এটি আমাদের দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে।

বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতির কারণ
Causes of Inflation in Bangladesh

অর্থের যোগান বৃদ্ধি: অর্থের যোগান বৃদ্ধি বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতির প্রধান কারণ। স্বাধীনতার পরে ১৯৭২ সালে, এদেশে মোট অর্থ যোগান (M1) ছিল ৪৮৫৭ মিলিয়ন টাকা এবং নভেম্বর ২০২২ পর্যন্ত তা বেড়ে দাঁড়ায় ৪৩৩১৬২৩ মিলিয়ন টাকা (উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক) । সুতরাং, অনিয়ন্ত্রিত এই অর্থের যোগান বৃদ্ধি মূল্যস্ফীতি এবং দামস্তর বৃদ্ধির জন্য বিশেষভাবে দায়ী।

খাদ্য ঘাটতি: খাদ্য ঘাটতি মূল্যস্ফীতি বাড়ায়। যখন চাহিদার তুলনায় খাদ্যের যোগান কম থাকে, তখন খাবারের দাম বেড়ে যায়। দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বন্যা, খরা বা অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে এ দেশে প্রতি বছর খাদ্য ঘাটতি দেখা যায়। দেশের চাহিদার তুলনায় খাদ্যশস্যের উৎপাদন কম হওয়ায় খাদ্যশস্যের দাম বৃদ্ধি পায়। সেই সাথে অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রীর দাম বাড়ে এবং সামগ্রিক দামস্তর বৃদ্ধি পায়।

আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্যের দাম বৃদ্ধি: বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতির কারণ হিসেবে আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্যের দাম বৃদ্ধির কথা বলা যায়। বাংলাদেশ খাদ্য আমদানিকারক দেশ হওয়ায় বিশ্ববাজারে খাদ্যদ্রব্যের যে কোনো মূল্যবৃদ্ধি এইসব দ্রব্যের অভ্যন্তরীণ দামের উপর প্রভাব ফেলে। চাল, গম এবং ভোজ্য তেলের মতো নিত্যপ্রয়োনীয় দ্রব্যের দাম আন্তর্জাতিক বাজারে বৃদ্ধি পেলে অভ্যন্তরীণ বাজারেও বেড়ে যায়।

জ্বালানির দাম বৃদ্ধি: জ্বালানির দাম হল আরেকটি কারণ যা অভ্যন্তরীণ মূল্য পরিস্থিতির উপর একটি বড় প্রভাব ফেলে। যদি জ্বালানীর দাম বেড়ে যায়, তাহলে তা দুইভাবে দ্রব্যের দামকে প্রভাবিত করে: এক, জ্বালানির উচ্চ মূল্য সেচের ব্যবস্থায় খরচ বৃদ্ধি করে, যা কৃষি উৎপাদনের খরচ বাড়ায় এবং দুই, জ্বালানীর উচ্চ দাম পরিবহন খরচ বাড়ায়, যা প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে শহুরে এলাকায় পরিবহন করা প্রয়োজনীয় জিনিসের দামও বাড়িয়ে দেয়। তাছাড়া যেসব শিল্পপ্রতিষ্ঠানে জ্বালানি উৎপাদনের উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়, সেগুলোতে দ্রব্যসামগ্রীর দাম বেড়ে যায়।

উদার ঋণ নীতি: ব্যাংক দ্বারা উদার ঋণ নীতি উচ্চ মূল্যস্ফীতির আরেকটি কারণ। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে এই নীতি গ্রহণ করা হয়। ফলে দ্রব্য উৎপাদনের চেয়ে উৎপাদন খরচ বেড়ে যায় এবং মূল্যস্ফীতি ঘটে।

মুদ্রার অবমূল্যায়ন: বাংলাদেশি মুদ্রার অবমূল্যায়নের ফলে টাকার বাহ্যিক মূল্য হ্রাস পায়। এর ফলে আমদানি দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পায়। স্বাধীনতার পর থেকে মার্কিন ডলারের বিপরীতে বাংলাদেশি টাকার বারবার অবমূল্যায়ন হয়েছে। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে ১ ডলারের সাথে টাকার বিনিময় হার ছিল ৭.৩৩ টাকা। ২০১০ সালে ডলারের বিনিময় হার দাঁড়ায় ৫৬.৩১

টাকায়। বর্তমানে ২০২৩ সালে ডলারের সাথে টাকার বিনিময় হার ১০৫ টাকারও বেশি। টাকার অবমূল্যায়ন বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতির অন্যতম আরেকটি কারণ।

ঘাটতি ব্যয়: প্রতিবছর সরকার তার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য বাজেট ঘাটতির সম্মুখীন হয়। সুতরাং অর্থের যোগান বৃদ্ধির মাধ্যমে এই ঘাটতি পূরণ করা হয়। ফলে মূল্যস্ফীতি ঘটে।

শ্রম খরচ: শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি প্রায়ই খরচ বৃদ্ধিজনিত মূল্যস্ফীতির মূল কারণ হিসেবে দেখা দেয়। উৎপাদনশীলতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বৃদ্ধি ছাড়াই মজুরি বৃদ্ধি মূল্যস্ফীতির সৃষ্টি করে।

রপ্তানি বৃদ্ধি: সাম্প্রতিক বছরগুলোতে রপ্তানির হার বেড়েছে। দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ না হওয়া সত্ত্বেও কিছু কিছু দ্রব্য ব্যাপক হারে রপ্তানি করা হয়। ফলে অভ্যন্তরীণ যোগান কমে যায় এবং মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পায়।

আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি: বাংলাদেশ প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী, যন্ত্রপাতি, মধ্যবর্তী পণ্য এবং কাঁচামাল আমদানি করা হয়। আন্তর্জাতিক বাজারে এসব আমদানি দ্রব্যের দাম বৃদ্ধির কারণে মূল্যস্ফীতি দেখা যায়।

রেমিটেন্স বৃদ্ধি: রেমিট্যান্স বৃদ্ধি মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধির সাথে সম্পর্কিত। গত কয়েক বছরে রেমিট্যান্স প্রবাহে স্থিতিশীল এবং উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি ঘটেছে। এই ধরনের প্রবাহ দেশে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুল্যস্ফীতি ঘটায়।

ব্যবসায়িক সিন্ডিকেট ও চোরাচালান: অপ্রতিযোগিতামূলক বাজার কাঠামো যা অসংখ্য মধ্যস্বত্বভোগী, পাইকারী বিক্রেতা এবং আমদানিকারকদের সমন্বয়ে "ব্যবসায়িক সিন্ডিকেট" নামে পরিচিত, তা বাংলাদেশে মূল্যবৃদ্ধির ক্ষেত্রে অবদান রাখার আরেকটি প্রধান কারণ। এ ধরনের অসাধু ব্যবসায়ী চাল, গম এবং ভোজ্য তেলের মতো প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী মজুদ করে দ্রব্যের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে এবং দাম বাড়ায়। আবার কিছু অসাধু ব্যবসায়ীও দ্রব্যসামগ্রী পাচার করে ঘাটতি তৈরি করে। ফলে দ্রব্যসামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পায় এবং মূল্যস্ফীতি ঘটে।

পে-স্কেল পরিবর্তন: সরকার যখন সরকারি কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি করে এবং তখন সে অনুপাতে উৎপাদন বাড়ে না। এ কারণে সামগ্রিক বাজার দামস্তর বৃদ্ধি পায়।

কালো টাকা: ঘুষ, দুর্নীতি, চোরাচালান ও আমদানিতে কারসাজির মাধ্যমে দেশে কালো টাকা সৃষ্টি হয়। কালো টাকার বৃহত্তর অংশ বিদেশে স্থানান্তরিত হয় এবং শুধু সামান্যই স্থায়ী আমানতে যায়। কালো টাকা অর্থনীতিতে কোনো ইতিবাচক অবদান রাখে না। এটি কর্মসংস্থান সৃষ্টি, উৎপাদন বা অন্য কোনো খাতে কোনো ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে না। বিপরীতে, এটি মূল্যস্ফীতির উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে যা দরিদ্রদের সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করে। কালো টাকার মালিকদের সীমাহীন ব্যয় উচ্চ আমদানি এবং দ্রব্যের দাম বৃদ্ধিকে সহায়তা করে।

বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতির প্রভাব

Impact of Inflation in Bangladesh

মূল্যস্ফীতি বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। স্বাধীনতার পরপরই সাধারণ মূল্যস্তর বৃদ্ধি পায় এবং মূল্যস্ফীতি দেখা যায়। কিছু অসাধু ব্যবসায়ী এবং কম উৎপাদনশীলতাই ছিল সে সময়ের মূল্যস্ফীতির প্রধান কারণ। কিন্তু বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে মূল্যস্ফীতিও অনেক বেশি। অবস্থা শোচনীয়। এই ধরনের পরিস্থিতিতে দিনমজুর, নিম্ন আয়ের মানুষ, কর্মচারী, ক্ষুদ্র কৃষক ও মধ্যম আয়ের মানুষ সর্বদা মূল্যস্ফীতির কারণে বাড়তি মূল্য পরিশোধ করে বা ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের বোঝা বহন করে।

বর্তমান সময়ে ক্রমবর্ধমান খাদ্য মূল্যস্ফীতি প্রধান উদ্বেগের বিষয়, কারণ খাদ্য মূল্যস্ফীতির সাথে দারিদ্র্য ও অসমতার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। বর্তমান সময়ে মার্কিন ডলারের বিপরীতে বাংলাদেশের মুদ্রা টাকার অবমূল্যায়ন দামের ও পর প্রভাব ফেলেছে। বাংলাদেশ খাদ্য আমদানিকারক দেশ হওয়ায় এ ধরনের বিনিময় হারের অবমূল্যায়ন আমদানি মূল্যের ওপর উর্ধ্বমুখী চাপ সৃষ্টি করে। আমদানি মূল্যবৃদ্ধি বাংলাদেশে প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের দামের আরও দাম বাড়ায়। প্রকৃত আয় হ্রাসের কারণে ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ায় খাদ্য মূল্যস্ফীতি দরিদ্রদের সবচেয়ে বেশি আঘাত করে।

এভাবে উচ্চ মূল্যস্ফীতি শ্রমিকদের দ্রুত মজুরি বৃদ্ধির দাবিকে প্ররোচিত করতে পারে, যাতে ভোক্তা মূল্যের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারে। এর ফলে মূল্যস্ফীতি আরও মূল্যস্ফীতির জন্ম দেয়।

মূল্যস্ফীতির সময়ে চোরাকারবারি ও মজুদদাররা প্রচুর মুনাফা করে। তাই তারা সবসময় এই পরিস্থিতি তৈরি করার চেষ্টা করে। এ সময় অর্থের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাসের ফলে প্রত্যাশিত ক্ষতি এড়াতে জনগণ বিভিন্ন ধরনের অপচনশীল দ্রব্য সম্পদের ভাণ্ডার হিসাবে ক্রয় করে।

তাছাড়া সরকার মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে অর্থাৎ অর্থের পরিমাণ হ্রাস করা জন্য বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন উপায়ে ঋণ নেয়। যার ফলে বেসরকারি খাতের ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে তারল্য সংকট দেখা দেয়, যা ব্যবসা এবং শিল্পে ঋণ দেওয়ার জন্য অর্থের ঘাটতি সৃষ্টি করে।

অতিরিক্ত মূল্যস্ফীতি সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। সঞ্চয়ের ওপর প্রভাব বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সরাসরি প্রতিফলিত হয়। এতে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বাধাগ্রস্ত হয়। বাংলাদেশের জন্য দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ অপরিহার্য এবং এটি প্রবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

মূল্যস্ফীতি আমাদের সামাজিক জীবনেও প্রভাব ফেলে। এটি দুর্নীতি, জালিয়াতি এবং দ্রুত অবৈধ অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা বাড়ায়।

সারসংক্ষেপ

- বাংলাদেশে খাদ্য ঘাটতি, জ্বালানির দাম বৃদ্ধি, উদার ঋণ নীতি, মুদ্রার অবমূল্যায়ন, সরকারের ঘাটতি ব্যয়, কালো টাকা, ব্যবসায়িক সিন্ডিকেট ও চোরাচালান ইত্যাদি কারণে মূল্যস্ফীতি ঘটে।
- মূল্যস্ফীতি বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে দিনমজুর, নিম্ন আয়ের মানুষ, কর্মচারী, ক্ষুদ্র কৃষক ও মধ্যম আয়ের মানুষ ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের বোঝা বহন করে। অতিরিক্ত মূল্যস্ফীতি সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। তাছাড়া মূল্যস্ফীতি আমাদের সামাজিক জীবনেও প্রভাব ফেলে।

পাঠ ৬.৫ মূল্যসংকোচনের কারণ ও ফলাফল
Causes and Consequences of Deflation

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

- মূল্যস্ফীতির সংজ্ঞা দিতে পারবেন;
- মূল্যসংকোচনের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- মূল্যসংকোচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মূল্যসংকোচন
Deflation

মূল্যস্ফীতির বিপরীত অবস্থা হচ্ছে মূল্যসংকোচন। যখন দ্রব্য ও সেবার সামগ্রিক মূল্যস্তর কমে যায়, তখন মূল্যস্ফীতির হার ঋণাত্মক হয়ে যায়। এ অবস্থাকে মূল্যসংকোচন বলে। মূল্যসংকোচন অবস্থায় অর্থের মূল্য বৃদ্ধি পায়। এ সময় মূলধন, শ্রম, দ্রব্য এবং সেবার আর্থিক খরচ কমে যায়, যদিও তাদের আপেক্ষিক দাম অপরিবর্তিত থাকতে পারে। ফলে একই পরিমাণ অর্থ দ্বারা আগের চেয়ে আরও বেশি দ্রব্য এবং সেবা ক্রয় করা যায়। অর্থাৎ অর্থের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

যখন সম্পদ এবং ভোক্তামূল্য সময়ের সাথে কমে যায় তখন মূল্যসংকোচন ঘটে। যদিও এটি ক্রেতাদের জন্য একটি দুর্দান্ত সুযোগ বলে মনে হতে পারে, তবে ব্যাপক মূল্যসংকোচনের প্রকৃত কারণ চাহিদার দীর্ঘমেয়াদি হ্রাস। মূল্যসংকোচন প্রায়ই আসন্ন মন্দার ইঙ্গিত দেয়। মন্দার সাথে সাথে মজুরি হ্রাস, চাকরি হারানো এবং বেশিরভাগ বিনিয়োগ খাতে বড় আঘাত আসে। এ অবস্থায় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের উৎপাদিত দ্রব্যের কম দাম নির্ধারণ করে যেন ভোক্তারা তাদের দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করে।

অর্থনীতিবিদ Paul Einzig এর মতে "মূল্যসংকোচন এমন একটি ভারসাম্যহীন অবস্থা যেখানে দামস্তরের নিম্নগতির প্রতিক্রিয়া হিসেবে অর্থনৈতিক শক্তি সংকুচিত হয়ে আসে"। অধ্যাপক Paul A. Samuelson বলেন, "মূল্যসংকোচন বলতে এমন অবস্থা বোঝায় যখন অধিকাংশ দ্রব্যসামগ্রীর দাম ও উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পেতে থাকে"।

সুতরাং বলা যায়, যখন কোনো দেশের দ্রব্যসামগ্রীর যোগান অপেক্ষা অর্থের যোগান কম হয় এবং দামস্তর ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায় তখন তাকে মূল্যসংকোচন বলে।

মূল্যসংকোচনের কারণ
Causes of Deflation

মূল্যসংকোচন অনেক কারণে ঘটতে পারে, যার সবকটিই চাহিদা ও যোগান রেখার পরিবর্তন থেকে সৃষ্টি হয়। চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তনের কারণে সমস্ত দ্রব্য ও সেবার মূল্যস্তর ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। যোগানের তুলনায় চাহিদা কমে গেলে, সামগ্রিক চাহিদা হ্রাস পায় এবং সেই অনুযায়ী দাম হ্রাস পায়। যদিও মূল্যসংকোচন ঘটার এমন অনেক কারণ রয়েছে, তথাপি নিম্নলিখিত কারণগুলো সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করে:

ভোক্তার চাহিদা হ্রাস: ভোক্তাদের চাহিদা হ্রাসের ফলে প্রায়শই দাম কমে যায়, যা মূল্যসংকোচন সৃষ্টি করে। ভোক্তা চাহিদা হ্রাসের জন্য কিছু সম্ভাব্য অবদানকারী কারণ হলো সরকারি ব্যয় হ্রাস বা সুদের হার বৃদ্ধি। যখন সুদের হার বেশি হয়, তখন জনগণ অর্থ সঞ্চয় করতে এবং কম ধার নিতে আগ্রহী হতে পারে, যার ফলে অর্থ কম খরচ হয়। ফলস্বরূপ, দামস্তর কমতে থাকে।

সুদের হার বৃদ্ধি: যখন কোনো দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদের হার বৃদ্ধি করে কঠোর মুদ্রানীতি ব্যবহার করে, তখন জনগণ অবিলম্বে তাদের অর্থ ব্যয় করার পরিবর্তে অর্থ বেশি সঞ্চয় করতে পছন্দ করে। ক্রমবর্ধমান সুদের হার অধিক ঋণ খরচের

দিকে পরিচালিত করে, যা অর্থনীতিতে ব্যয়কে নিরুৎসাহিত করে। ফলে বাজারে আর্থিক লেনদেন কমে যায় এবং দামস্তর কমতে থাকে, যা মূল্যসংকোচন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে।

উৎপাদন খরচ হ্রাস: যদি উৎপাদনের মূল উপকরণগুলোর (যেমন, তেল) দাম কমে যায়, তাহলে উৎপাদন খরচ কম হবে। তখন উৎপাদকরা মুনাফার আশায় একই পরিমাণ মূলধন দিয়ে উৎপাদন বাড়াবে, যা অর্থনীতিতে অতিরিক্ত যোগানের সৃষ্টি করবে। এমতাবস্থায় চাহিদা অপরিবর্তিত থাকলে, উৎপাদকদের দ্রব্যের দাম কমাতে হবে যাতে জনগণ তাদের দ্রব্য বেশি পরিমাণ ক্রয় করে। ফলে অর্থনীতিতে মূল্যসংকোচন সৃষ্টি হবে।

প্রযুক্তিগত উন্নতি: প্রযুক্তির উন্নতি বা উৎপাদনে নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগ উৎপাদন বাড়িয়ে সামগ্রিক যোগান বৃদ্ধির কারণ হতে পারে। প্রযুক্তিগত উন্নতি উৎপাদকদের খরচ কমাতে সাহায্য করে। এতে দামস্তর হ্রাসের মাধ্যমে মূল্যসংকোচন সৃষ্টি হয়।

আত্মবিশ্বাস হ্রাস: অর্থনীতিতে নেতিবাচক ঘটনা, যেমন মন্দার কারণে সামগ্রিক চাহিদা হ্রাস পেতে পারে। কারণ এ সময় জনগণ অর্থনীতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আরও হতাশাবাদী হয়ে উঠতে পারে। ফলস্বরূপ, তারা তাদের সঞ্চয় বাড়াতে এবং বর্তমান ব্যয় কমাতে পছন্দ করে। এতে দামস্তর কমতে থাকে এবং মূল্যসংকোচন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

মূল্যসংকোচনের ফলাফল
Results of Deflation

অর্থনীতিতে বেশির ভাগ মন্দার সময় মূল্যসংকোচন ঘটে। এটি একটি প্রতিকূল অর্থনৈতিক ঘটনা হিসাবে বিবেচিত হয় এবং অর্থনীতিতে অনেক নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে, যার মধ্যে রয়েছে:

১। উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের ওপর প্রভাব
মূল্যসংকোচনের সময় উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। ফলে উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ী শ্রেণি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মূল্যসংকোচনের সময় দামস্তর ও বিনিয়োগ হ্রাস পায়। যেহেতু দামস্তর কমে, সেহেতু উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ীদের মুনাফা হ্রাস পায়। এর ফলে বিনিয়োগ হ্রাস পায় এবং খরচ কমানোর জন্য উৎপাদন প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের কর্মচারীদের ছাঁটাই করে। ফলস্বরূপ, জাতীয় উৎপাদন হ্রাস পায় এবং বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়।

২। স্থির আয় উপার্জনকারী এবং শ্রমিক শ্রেণির ওপর প্রভাব
স্থির আয় উপার্জনকারী এবং মজুরি উপার্জনকারী ব্যক্তিরা মূল্যসংকোচনের সময় লাভবান হতে পারে। কারণ, দাম কমার সঙ্গে সঙ্গে বেতন ও মজুরি কমানো যায় না। দামস্তর কমায় তারা পূর্বের চেয়ে বেশি দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করতে পারে।

৩। ভোক্তার উপর প্রভাব
ভোক্তার উপর মূল্যসংকোচনের স্বল্পমেয়াদি প্রভাব ইতিবাচক হতে পারে, কারণ দ্রব্য ও সেবার মূল্য হ্রাস ভোক্তার ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। কম দামস্তর ভোক্তাদের ব্যয়কে নিরুৎসাহিত করে, কারণ এসব দ্রব্য ও সেবা ভবিষ্যতে আরও সস্তা হবে। আবার অনেক ভোক্তাদের সঞ্চয়ে উৎসাহিত করে। তবে বেকারত্বের ক্রমবর্ধমান হার কার্যকর হওয়ায় দীর্ঘ মেয়াদে মূল্যসংকোচন ভোক্তাদের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

৪। বিনিয়োগকারীদের উপর প্রভাব
মূল্যসংকোচনের সময় দ্রব্য ও সেবার দাম কমার পাশাপাশি, সম্পদের দামও কমে। ফলে নগদ অর্থ হাতে ধরে রাখার আপেক্ষিক মূল্য বাড়ে। এটি কম বিনিয়োগকে উৎসাহিত করে যা কোম্পানিসমূহের স্টকসহ সম্পদের দামের আরও পতন ঘটায়।

৫। ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার উপর প্রভাব
মূল্যসংকোচন অর্থ এবং ঋণের প্রকৃত মূল্য বৃদ্ধি করে। এ কারণে ঋণদাতারা লাভবান হয়। কারণ তারা ফেরতকৃত ঋণের টাকা দিয়ে পূর্বের চেয়ে বেশি দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করতে পারে। অন্যদিকে, মূল্যসংকোচন ঋণগ্রহীতাদের জন্য ঋণ পরিশোধ করা আরও কঠিন করে তোলে। কারণ তাদের ঋণের টাকা ফেরত দেয়ার সময় পূর্বাপেক্ষা বেশি দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয় করতে হয়। অতএব, ভোক্তা এবং উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলোকে ঋণ পরিশোধের জন্য আয়ের একটি বড় শতাংশ ব্যয় করতে হয়।

৬। করদাতা ও করগ্রহীতা উপর প্রভাব

মূল্যসংকোচনের সময় করদাতারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। কারণ অর্থের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় দ্রব্যসামগ্রীর হিসেবে তাদেরকে বেশি সম্পদ ত্যাগ করতে হয়। কিন্তু করগ্রহীতা হিসেবে সরকার লাভবান হয়, কারণ সরকার কর হতে যে পরিমাণ রাজস্ব আয় পায় মূল্যসংকোচনের সময় তার প্রকৃত মূল্য বৃদ্ধি পায়।

৭। কৃষকশ্রেণির উপর প্রভাব

মূল্যসংকোচনের সময় কৃষকশ্রেণি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ এ সময় দামস্তর কমে যাওয়ায় জমিতে উৎপাদিত ফসল কম দামে বিক্রি করতে হয়। ফলে তারা ফসলের ন্যায্য দাম পায় না।

৮। ব্যবসায়ের ওপর প্রভাব

মূল্যসংকোচনের সময় ভোক্তার চাহিদা হ্রাসের ফলে দামের যে পতন ঘটে, তাতে ব্যবসায়সমূহের সম্ভাব্য বিক্রয় হ্রাস পায়। তবে তারা ক্রমবর্ধমান ঋণের বোঝা এবং নিম্ন ঋণ গ্রহণের ক্ষমতার সম্মুখীন হতে পারে; বিশেষ করে যদি উচ্চ সুদের হার মূল্যসংকোচনের কারণ হয়ে থাকে। ব্যবসা ঋণের খেলাপি বা এমনকি দেউলিয়াত্বের জন্য উন্মুক্ত হতে পারে।

৮। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ওপর প্রভাব

যেহেতু মূল্যসংকোচনে দামস্তর হ্রাস পায় ও ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে, সেহেতু এটি খরচ কমাতে এবং সঞ্চয়ে প্রণোদনা সৃষ্টি করে। দামস্তর ক্রমাগত হ্রাস পেতে থাকলে ব্যবসা-বাণিজ্যের গতি কমে যায়, লেনদেন হ্রাস পায়। ফলস্বরূপ, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে স্থবিরতা দেখা যায়।

মূল্যস্ফীতির মতোই, মূল্যসংকোচন একটি ক্রমাগত চক্র, যেখানে সময়ের সাথে সাথে দাম কমতে থাকে। এ সময় ভোক্তারা দীর্ঘ মেয়াদে অর্থ ব্যয় হ্রাস করে। ফলে চাহিদা ক্রমাগত হ্রাস পেতে থাকে, যার ফলে আরও মূল্যসংকোচন ঘটে। আবার বিক্রয় হ্রাস পাওয়ায় উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলো নতুন প্রকল্পে বিনিয়োগ বন্ধ করে দেয় এবং কর্মচারী ছাঁটাই করে। উৎপাদন হ্রাস এবং ব্যাপক বেকারত্বের কারণে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি হ্রাস পায় এবং দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

সারসংক্ষেপ

- **মূল্যসংকোচন** হচ্ছে মূল্যস্ফীতির বিপরীত অবস্থা; অর্থাৎ যখন দ্রব্য ও সেবার সামগ্রিক দামস্তর কমে যায় তখন মূল্যস্ফীতির হার ঋণাত্মক হয়ে যায়। এ অবস্থাকে মূল্যসংকোচন বলে।
- মূল্যসংকোচনের ফলে উদ্ভুত উৎপাদন হ্রাস এবং ব্যাপক বেকারত্ব একটি অর্থনীতিকে স্থবির করে দিতে পারে।

পাঠ ৬.৬ মূল্যসংকোচন নিয়ন্ত্রণ
Deflation control

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

- মূল্যসংকোচনের কারণ নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন,
- মূল্যস্ফীতি এবং মূল্যসংকোচনের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারবেন।

মূল্যসংকোচন নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি
Method of Deflation Control

মূল্যসংকোচন নিয়ন্ত্রণের জন্য সামগ্রিক চাহিদার পরিমাণ বাড়ানোর চেষ্টা করা আবশ্যক। এটি অর্থনীতিতে উৎপাদন, আয় ও কর্মসংস্থান বাড়াবে। আংশিকভাবে ভোগ ব্যয়কে উৎসাহিত করে এবং বিনিয়োগ ব্যয় বৃদ্ধি করে সামগ্রিক চাহিদা বাড়ানো যায়। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য গৃহীত পদ্ধতির ঠিক বিপরীত পদ্ধতিতে আর্থিক ও রাজস্ব ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে মূল্যসংকোচন নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।

আর্থিক ব্যবস্থা
Monetary Measures

মুদ্রা সম্প্রসারণ: মুদ্রা সম্প্রসারণের মাধ্যমে মূল্যসংকোচন নিয়ন্ত্রণ করা যায়। দেশে মুদ্রার সরবরাহ বাড়াতে নতুন নোট ইস্যু করতে পারে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এভাবে অর্থনীতিতে বাড়তি অর্থ প্রবেশ করানো যায় এবং এতে মানুষ বেশি আয় পায়। তারা দ্রব্য এবং সেবার জন্য বেশি ব্যয় করে। চাহিদা বৃদ্ধি পায়, যা উৎপাদনের মাত্রা বাড়ায়। এইভাবে মূল্যসংকোচনকে অর্থনীতি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়।

ঋণ সম্প্রসারণ: ঋণ সম্প্রসারণ মূল্যসংকোচন নিয়ন্ত্রণের আরেকটি পদ্ধতি। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো সুদের হার হ্রাসের মাধ্যমে ঋণের পরিমাণ বাড়াতে পারে। এতে ব্যবসায়িক কার্যক্রম বেড়ে যায় এবং মূল্যসংকোচন নিয়ন্ত্রণে আসে।

ব্যাংক হার হ্রাস: ব্যাংক হার কমিয়ে মূল্যসংকোচন নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোতে আরও অর্থ সরবরাহ করতে ব্যাংক হার কমাতে পারে। নিম্ন ব্যাংক হার ব্যাংকগুলোর জন্য অর্থনীতিতে অর্থের যোগান কম এই ইঙ্গিত বহন করে। তখন ব্যবসার প্রয়োজন মেটাতে ব্যাংকগুলো আরও ঋণ দেয়। প্রয়োজনে তারা কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ পেতে পারে। এভাবে নিম্ন ব্যাংক হার মূল্যসংকোচন মোকাবেলা করতে সাহায্য করে।

রিজার্ভ অনুপাত হ্রাস: রিজার্ভ অনুপাত হ্রাস মূল্যসংকোচন নিয়ন্ত্রণ করার একটি হাতিয়ার। বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ দান ক্ষমতা বাড়াতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক নগদ রিজার্ভ অনুপাত হ্রাস করে। যা বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে আরও ঋণ দিতে উৎসাহিত করে। আবার তহবিলের ঘাটতি হলে ব্যাংকগুলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে পারে। ঋণের ক্রমবর্ধমান হার ও যোগান মূল্যসংকোচন নিয়ন্ত্রণে আরেকটি পদক্ষেপ।

রাজস্ব ব্যবস্থা
Fiscal Measures

সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি: কেইন্সীয়ান অর্থনীতিবিদরা সামগ্রিক চাহিদাকে উৎসাহিত করতে এবং অর্থনীতিকে মূল্যসংকোচন থেকে বের করে আনতে রাজস্ব নীতি অনুসরণ করতে বলেন। কর্মসংস্থানের পাশাপাশি উৎপাদন অব্যাহত রাখার জন্য সরকার শেষ অবলম্বন হিসেবে ব্যয় করতে পারে। এক্ষেত্রে ঘাটতি অর্থায়ন পদ্ধতি অর্থাৎ, নতুন অর্থ ছাপানোর মাধ্যমে অর্থায়ন করা উচিত। সরকারের উচিত বাজেট ঘাটতি গ্রহণ করা এবং ঘাটতি অর্থায়নের মাধ্যমে এই ঘাটতি পূরণ করা। ব্যবসায়

প্রতিষ্ঠান এবং তাদের কর্মীরা সেই সরকারি অর্থ ব্যয় এবং বিনিয়োগের জন্য ব্যবহার করবে যতক্ষণ না দাম আবার চাহিদার সাথে বাড়তে শুরু করে।

কর হ্রাস: কর হ্রাস করেও মূল্যসংকোচন নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। এতে জনগণের হাতে ব্যয়যোগ্য আয়ের পরিমাণ বেড়ে যাবে। ফলে দ্রব্য ও সেবার চাহিদা বাড়বে। তাছাড়া বিনিয়োগে উৎসাহিত করার জন্য ব্যবসায়ীদের পর্যাপ্ত কর ছাড় দিতে হবে। এতে ব্যবসায়ীরা উৎপাদন বাড়ানোর চেষ্টা করেন। মূল্যসংকোচন নিয়ন্ত্রণে এ ধরনের পদক্ষেপ কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

নতুন বিনিয়োগ: নতুন বিনিয়োগ করেও মূল্যসংকোচন নিয়ন্ত্রণ করা যায়। নতুন নতুন কলকারখানা স্থাপন করতে বিনিয়োগ ব্যবহার করা যেতে পারে। ফলে অর্থ অলসভাবে পড়ে না থেকে উৎপাদনশীল খাতে স্থানান্তরিত হয়। নতুন বিনিয়োগের ফলে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়। ফলে মূল্যসংকোচন কাটিয়ে জনগণের কল্যাণে অর্থনীতি পরিচালিত হয়।

আয়ের পুনর্বণ্টন: ধনী থেকে দরিদ্রের মধ্যে আয় এবং সম্পদের পুনঃবণ্টনের মাধ্যমে প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা বাড়ানো যেতে পারে। যেহেতু দরিদ্রদের প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা বেশি এবং ধনীদের কম, তাই এই ধরনের ব্যবস্থা অর্থনীতিতে সামগ্রিক চাহিদা বাড়াতে সাহায্য করবে।

সরকারি ঋণ পরিশোধ: মূল্যসংকোচন নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার হিসেবে সরকার পুরোনো সরকারি ঋণ পরিশোধ করতে পারে। অর্থের যোগান বাড়াতে সরকার ঋণ ফেরত দিতে পারে। ফলস্বরূপ, জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, ব্যাংকগুলো আয় বাড়বে এবং ব্যবসায়ীরা আগের চেয়ে বেশি ঋণ পেতে পারে। অর্থাৎ, দেশে অর্থের প্রবাহ বৃদ্ধির মাত্রা বেড়ে যাবে। এটি মূল্যসংকোচন নিয়ন্ত্রণের কাজটি সহজ করে দেবে।

গণপূর্ত কর্মসূচি: সরকার মূল্যসংকোচন দূর করার জন্য গণপূর্ত কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারে। যেমন- রাস্তাঘাট, বাঁধ, সেতু, হাসপাতাল, স্কুল ও বিদ্যুৎ প্রকল্প ইত্যাদি নির্মাণে সরকার অর্থ ব্যয় করতে পারে। এর ফলে সরকার থেকে অর্থ সাধারণ জনগণের কাছে স্থানান্তরিত হয় এবং জনগণের আয় বাড়ে। দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং উৎপাদন বাড়ে, যা মূল্যসংকোচন দূর করার আরেকটি উপায়। তবে খেয়াল রাখতে হবে যাতে এ ধরনের কর্মসূচি বেসরকারি খাতে বিনিয়োগের ওপর বিরূপ প্রভাব না ফেলে।

বৈদেশিক বাণিজ্য নীতি: মূল্যসংকোচন নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারের উচিত এমন বৈদেশিক বাণিজ্য নীতি গ্রহণ করা যাতে একদিকে রপ্তানি বাড়ে, অন্যদিকে আমদানি হ্রাস পায়। এই ধরনের নীতি অতিরিক্ত উৎপাদনের সমস্যা সমাধানে এবং মূল্যসংকোচন কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করবে।

সুতরাং, অর্থনীতিতে মূল্যসংকোচন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য শুধু আর্থিক নীতি বা রাজস্ব নীতি যথেষ্ট নয়। মূল্যসংকোচনজনিত পরিস্থিতি কার্যকরভাবে মোকাবেলা করার জন্য আর্থিক, রাজস্ব এবং অন্যান্য ব্যবস্থার একটি সঠিক সমন্বয় অপরিহার্য।

মূল্যস্ফীতি এবং মূল্যসংকোচন এর মধ্যে পার্থক্য

Difference between Inflation and Deflation

সংজ্ঞাগতগত পার্থক্য: মূল্যস্ফীতি হচ্ছে এমন একটি পরিস্থিতি যখন দ্রব্য ও সেবার দাম বৃদ্ধি পায়, ফলে অর্থের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়। অন্যদিকে মূল্যসংকোচন হচ্ছে মূল্যস্ফীতির বিপরীত অবস্থা, যার ফলে দ্রব্য ও সেবার দাম কমে যায় এবং লোকেরা সীমিত অর্থে আগের চেয়ে বেশি দ্রব্য ক্রয় করতে পারে।

দামস্তরের ভিত্তিতে পার্থক্য: মূল্যস্ফীতির সময় অর্থনীতিতে সাধারণ মূল্য স্তর ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে মূল্যসংকোচনে একটি দেশের অর্থনীতিতে সাধারণ মূল্য স্তর ক্রমাগত হ্রাস পায়।

অর্থের ক্রয়ক্ষমতার ভিত্তিতে পার্থক্য: মূল্যস্ফীতিতে অর্থের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পায়। কিন্তু মূল্যসংকোচনে অর্থের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

সামগ্রিক চাহিদার ভিত্তিতে পার্থক্য: মূল্যস্ফীতিতে সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে মূল্যসংকোচনে সামগ্রিক চাহিদা হ্রাস পায় ।

বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের ভিত্তিতে পার্থক্য: মাঝারি মূল্যস্ফীতিতে দেশে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে মূল্যসংকোচনে দেশে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান হ্রাস পায় ।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ভিত্তিতে পার্থক্য: মৃদু মূল্যস্ফীতি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক। কিন্তু মূল্যসংকোচন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে।

মূল্যস্ফীতি এবং মূল্যসংকোচনের মধ্যে কোনটি বেশি ক্ষতিকর?

Which is more harmful between inflation and deflation?

যদিও মাঝারি মূল্যস্ফীতির মাত্রা বিনিয়োগ, উৎপাদন এবং কর্মসংস্থানকে উৎসাহিত করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়ায়, কিন্তু মূল্যসংকোচন অর্থনীতিকে মন্দার দিকে পরিচালিত করে। তবে সম্পদ ও আয়ের বণ্টনের ক্ষেত্রে মূল্যসংকোচনের চেয়ে মূল্যস্ফীতি খারাপ। সর্বোত্তম পরিস্থিতি অবশ্যই এমন হবে যেখানে সম্পদ এবং আয়ের বণ্টনে সর্বাধিক সমতার পাশাপাশি পূর্ণ কর্মসংস্থান বজায় থাকবে। এখন প্রশ্ন হলো মূল্যস্ফীতি এবং মূল্যসংকোচন, কোনটি বেশি ক্ষতিকর? মূল্যসংকোচন নিম্নলিখিত কারণে মূল্যস্ফীতির চেয়ে বেশি ক্ষতিকারক।

(ক) মূল্যস্ফীতির প্রাথমিক পর্যায়ে উৎপাদন, আয় এবং কর্মসংস্থানের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় যদিও পরবর্তী পর্যায়ে তা বাড়ে না। কিন্তু, মূল্যসংকোচনের সকল পর্যায়ে উৎপাদন, আয় ও কর্মসংস্থানের পরিমাণ ক্রমাগত হ্রাস পায়।

(খ) মৃদু মূল্যস্ফীতি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে উদ্দীপিত করে; কিন্তু মূল্যসংকোচন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করে এবং পুরো আর্থিক ব্যবস্থার পতন ঘটাতে পারে।

(গ) যদিও মূল্যস্ফীতি অর্থনীতিতে বৈষম্যের মাত্রা বাড়ায়, তবে যথাযথ আর্থিক ও রাজস্ব ব্যবস্থার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণে রেখে এর কুফল কমিয়ে আনা যায়, কিন্তু মূল্যসংকোচনের খারাপ প্রভাব নিরাময় করা খুবই কঠিন।

(গ) মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আর্থিক ব্যবস্থাসমূহ যতটা কার্যকর, মূল্যসংকোচন নিয়ন্ত্রণে তারা এতটা কার্যকর হয় না । মূল্যসংকোচনের সময় বিনিয়োগের প্রান্তিক দক্ষতা খুব কম হয়ে যায়। এই সময়ে অর্থের যোগান বৃদ্ধি অর্থনীতিতে পুনরুজ্জীবন শুরু করতে পারে না। কারণ এটি বিনিয়োগের প্রান্তিক দক্ষতার ওপর খুব বেশি প্রভাব ফেলে না। কিন্তু, অর্থের যোগান হ্রাস মূল্যস্ফীতির অবসান ঘটাতে পারে।

সামগ্রিকভাবে অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে, মূল্যস্ফীতি বা মূল্যসংকোচন কোনোটাই কাম্য নয়। কারণ উভয়ই অর্থনীতিতে অস্থিতিশীলতা নিয়ে আসে।

সারসংক্ষেপ

- কিছু আর্থিক এবং রাজস্ব নীতি মূল্যসংকোচনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এবং দাম ও অর্থনৈতিক কার্যকলাপ নিচের দিকে নামিয়ে আনতে অর্থাৎ সময়ের সাথে সাথে হ্রাস পাওয়া থেকে রক্ষা করতে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- মূল্যসংকোচন মূল্যস্ফীতির চেয়ে খারাপ, কারণ মূল্যসংকোচন এমন একটি অবস্থা যেখানে অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেতে থাকে। বাজারে অর্থ সরবরাহ কম থাকায় দ্রব্য ও সেবার চাহিদা হ্রাস পায়। এর ফলে উৎপাদন প্রতিষ্ঠান তাদের উৎপাদন হ্রাস করে । ফলে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান উভয়ই হ্রাস পায়।

ইউনিট উত্তর মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। মূল্যস্ফীতি কাকে বলে?
২। চাহিদা বৃদ্ধিজনিত ও খরচ বৃদ্ধিজনিত মূল্যস্ফীতির মধ্যে পার্থক্য কী?
৩। মূল্যস্ফীতির কারণ কী কী?
৪। মূল্যসংকোচন কাকে বলে?
৫। মূল্যসংকোচনের কারণ কী কী?
৬। মূল্যস্ফীতি ও মূল্যসংকোচনের মধ্যে কোনটি বেশি খারাপ এবং কেন?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। মূল্যস্ফীতির শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা করুন।
২। চিত্রের সাহায্যে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত ও খরচ বৃদ্ধিজনিত মূল্যস্ফীতি ব্যাখ্যা করুন।
৩। মূল্যস্ফীতির কারনসমূহ আলোচনা করুন।
৪। মূল্যস্ফীতির প্রভাবসমূহ বর্ণনা করুন।
৫। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে পদ্ধতি আলোচনা করুন।
৬। বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতির কারণসমূহ বর্ণনা করুন।
৭। বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি কী ধরনের প্রভাব ফেলে আলোচনা করুন।
৮। মূল্যসংকোচনের কারণসমূহ আলোচনা করুন।
৯। মূল্যসংকোচনের প্রভাবসমূহ বর্ণনা করুন।
১০। মূল্যসংকোচন নিয়ন্ত্রণে পদ্ধতিগুলো কী কী? আলোচনা করুন।